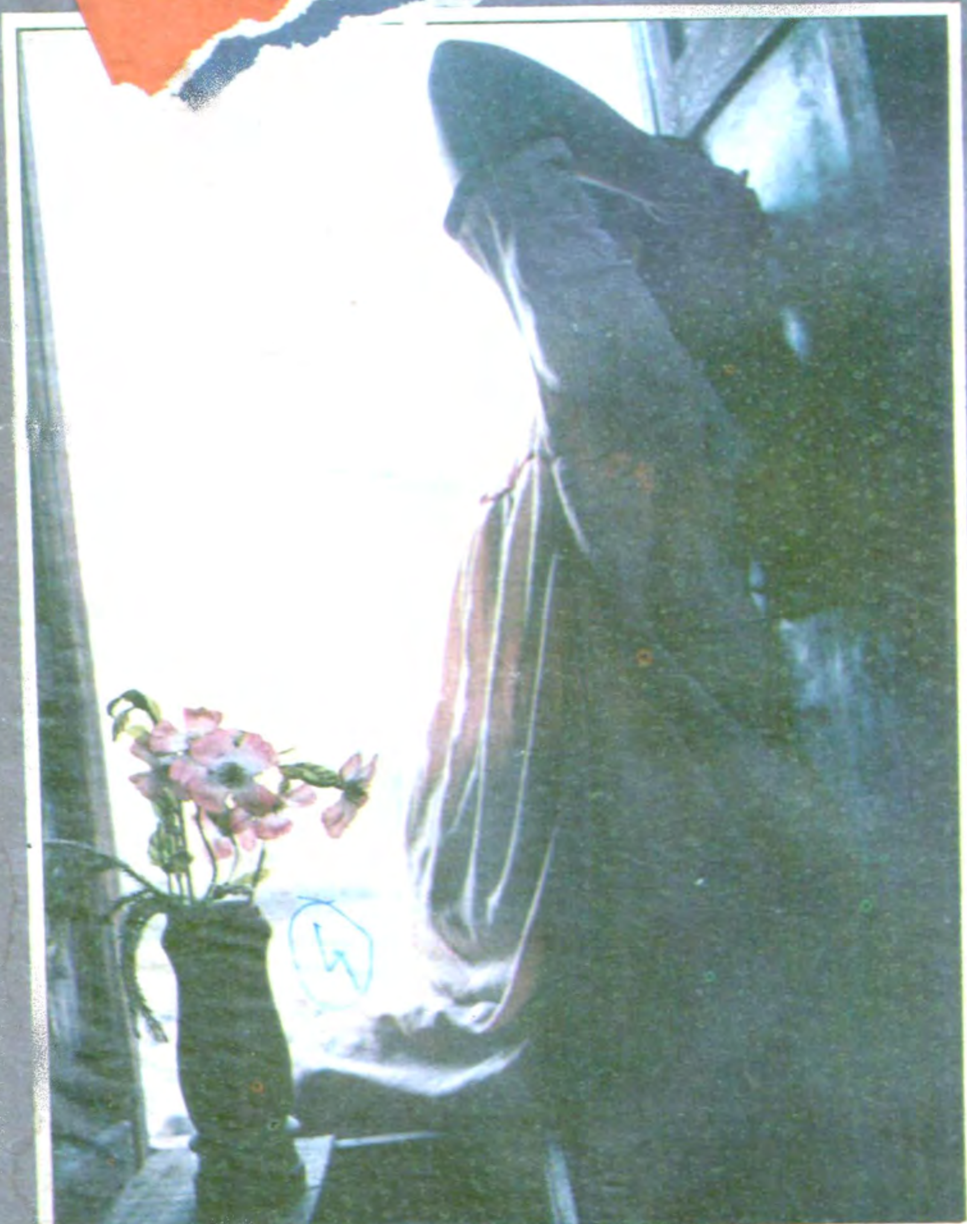
মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা

সুকন্যা

৫ এপ্রিল ১৯৮৮

কুমারী মাতৃত্ব বিষয়ে মতামত দিয়েছেন
মাদার তেরেজা, নবনীতা দেবসেন,
মনমুন সেন সহ অন্য অনেকে

কুমারী মাতৃত্ব



ছেলে মেয়ে সমান সমান

বালিকা বধূ না প্রসূতি বলি!

গরমের দিনে রূপচর্চা

কার্ল মার্কসের প্রেম

টিউনিশিয়ান স্টিচের সাইড ব্যাগ



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি ও স্ক্যান : অরূপ রাউত

এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

সেন্টার-টেবিলে বিশ্ব

কৃত্রিম উপগ্রহ কারিগরি-কৌশলে সমস্ত বিশ্ব এখন আপনার দূরদর্শনের পর্দায় – শুধু চাবি ঘোরানোর অপেক্ষায়। কিন্তু দূরদর্শনের ছবির মিছিল তাৎক্ষণিক। আপনার প্রয়োজনের এই মুহূর্তে বিশ্বের ধমনীর গতি স্থায়িভাবে রেকর্ড করে সুদৃশ্য পাতার মোড়কে

পরিবর্তন



আপনার ড্রইং রুমের সেন্টার টেবিলে। পাতা উল্টে দেখুন

আসল ব্যাপারটা কী ?

প্রাত্যহিক প্রভাতী সংবাদপত্রে সংবাদের মিছিল। সংবাদপাঠের পর আপনার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু মনে জাগে অতৃপ্তি। আপনার মনে হয় এসব তো ঘটনার রিপোর্ট মাত্র। ঘটনাটা ঘটল কেন আড়ালে আসল ব্যাপারটা কী যেমন ধরুন, কলকাতা এবং আশেপাশের বাজারগুলি একের পর এক আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। এ খবর আপনি জানেন। কিন্তু পুড়ে কেন যাচ্ছে জানেন কি ? 'পরিবর্তন' উল্টে দেখুন, ঘটনার নেপথ্যে ঘটনার অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক দুঃসাহসী প্রতিবেদন।

..মাসের শেষে সাড়ে তিন টাকা কেজি

মাসের শেষে সারা মাসের সংবাদপত্রের স্তূপকে আপনার মনে হয় জঞ্জাল। তখন ডাক পড়ে কাগজওয়ালার। সাড়ে তিন টাকা কেজি দরে সে আপনার জঞ্জাল সাফ করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 'পরিবর্তন' আপনার সেন্টার টেবিল থেকে ঢুকে যাবে বইয়ের আলমারিতে – সপ্তাহের পর সপ্তাহ – মাসের পর মাস – বছরের পর বছর। কারণ 'পরিবর্তন'-এ প্রকাশিত হাজারো তথ্য যে কোন সময় আপনার প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে।

রাজীব গান্ধী ও ফুলগ্রামের নীলিমা সোম

রোনাল্ড রেগন, মিখাইল গর্বাচেভ, রাজীব গান্ধী সংবাদের কেন্দ্রে। যে কোন সংবাদ সাময়িকীর মত 'পরিবর্তন'-এও এঁদের জন্য বায়িত হয় পাতার পর পাতা – কিন্তু আমরা মনে করি – এই জটিল সময়ে, এই সব রথী-মহারথীদের পাশাপাশি জীবনযুদ্ধের অতি সাধারণ যোদ্ধারও জীবনকথা না বলা হলে একটি সাময়িকপত্র সম্পূর্ণ হয় না। তাই ফুলগ্রামের নীলিমা সোমের কথা এখানে স্থান পায় সমমর্যাদায় রাজীবের পাশাপাশি। তাতে রাজীব গান্ধী যাই মনে করুন না কেন।

'পরিবর্তন' অপরিবর্তনীয়

আর তাই 'পরিবর্তন' অপরিবর্তনীয়। আপনি একবার 'পরিবর্তন' পড়া শুরু করলে আর অন্য কোনো কাগজে আপনার পাঠাভ্যাস পরিবর্তন করতে পারবেন না। যে কোনো সংখ্যা থেকেই পড়া শুরু করে দেখুন না কেন !

বর্ষ ৪ সংখ্যা ৯ ১ – ১৫ এপ্রিল ১৯৮৮/১৮ চৈত্র – ২ বৈশাখ ১৩৯৫

সম্পাদিকা : গীতা চৌধুরী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : গৌতম দাশগুপ্ত
ফটো : সৌগত রায় বর্মন

প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা
বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ৩0 পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪0 পয়সা

বধূহত্যাকারীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন

বিগত ১ – ১৫ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রধান রচনা –'সব বধূকেই কি পুড়িয়ে মারা হচ্ছে ?' – পড়লাম। লেখাটিতে বারবারই একটা কথা ঘুরে ফিরে এসেছে যে বধূহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হিড়িকে পুলিশ, আইন, সমাজ মৃতার স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকেদের হয়রান করছে। অথচ শেষ পর্যন্ত হয়ত দেখা যাচ্ছে ঘটনাটি হত্যার নয় আত্মহত্যার। আর এখানেই লেখক জেনে বা না জেনে বধূহত্যাকারীদের হাতে একটা অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। বলা ভাল, তাদেরই ব্যবহৃত একটি অস্ত্রে স্বেচ্ছায় শান দিয়েছেন। আত্মহত্যা প্রমাণ হলেই কি হাত ধুয়ে ফেলার সুযোগ থেকে যায় বহু আত্মহত্যাই কি আসলে হত্যা নয় তিল তিল করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, বারংবার নানাভাবে মরতে বলে আত্মহত্যার পুরোচনা দেওয়া কী হত্যার চেয়ে কম অপরাধ সৌরেনবাবু নিজেই তো উল্লেখ করেছেন এক শিপ্রার কথা। গান বাজনায় তার অনুরাগকে স্বামীর পরিবার মেনে নিতে পারল না। আত্মহত্যার দিন জলসা সেরে ফেরার পর এমন কি স্বামীও তাকে ঘরে ঢুকতে দিলেন না। এরপর শিপ্রা গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন। লেখক নিজেই বলুন – এটা আত্মহত্যা না হত্যা ? ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবাংলায় অধিকাংশ পরিবারেই গঞ্জনা, লাঞ্ছনার কোন লিখিত বা প্রামাণ্য রূপ থাকে না। অশিক্ষিতদের কথাই নেই, শিক্ষিত মেয়েরাও বাপের বাড়িতে লিখিত অভিযোগ করার আগে পাঁচবার ভাবে। কারণ শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসার সিদ্ধান্ত (যদি আসার জায়গা আদৌ থাকে) নেওয়া উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় বা বাঙালি মেয়ের পক্ষেও বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার। সেক্ষেত্রে পুরোচনার সাক্ষ্যপ্রমাণ অনেকটাই নির্ভর করে পাড়াপ্রতিবেশি আত্মীয়দের 'সারকামস্টানসিয়াল এভিডেন্সের'র উপর। বলাবাহুল্য আমরা বাঙালিরা হুজুগে জাত। বধূহত্যার নৃশংসতায় স্বম্ভিত হয়ে ঘটনার দিন প্রবল প্রতিবাদে প্রগতিশীল হয়ে ওঠার কিছুদিন পরই আপনি অফিস বা অন্য কিছু কামাই করে কোর্টে দৌড়োনোর প্রশ্নে আমাদের বিবেক মিইয়ে আসে। আমাদের কবন্ধ বিচারব্যবস্থার আমলাতান্ত্রিকতা এই মনোভাবকে উৎসাহ দেয় মাত্র। বহু ক্ষেত্রে আবার পুলিশ তদন্তে উদ্যোগ নেয় না। এত কিছু সত্ত্বেও নিরপরাধ শাশুড়ি বা ননদ থাকতেই পারেন। সৌরেনবাবুর কথায় মেয়েরা একটু 'আত্মাভিমানী'। কোন মেয়ে হয়ত 'সামান্য' ঝগড়াঝাঁটিতেই আত্মহত্যা করে বসল। সেক্ষেত্রে শাশুড়ি-ননদের হেনস্থা দেখে সমবেদনা আসতেই পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সামান্য ধারণাটি তো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করে। মূল্যবোধের ভাঙন ও নয়া গঠন তো চলছেই। সেকালে মেয়েরা সেটাকে শ্বশুরবাড়িতে ন্যায্য পাওনা বলে মেনে নিতে শিখত। আজ সেটা তারা মানবে কেন ? সেক্ষেত্রে 'সামান্য' কথা বা অপমানই হয়ত তাকে আত্মহত্যার সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। এক্ষেত্রে ওই সামান্য কথাই পুরোচনা।' লেখক নিশ্চয়ই জানেন, আমরা এখনও সনাতন ভারতবর্ষে বাস করি, এবং আমাদের শহরগুলি আসলে কিছু পালিশ করা গ্রামমাত্র। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিতের সংসারেও তাই নতুন আসা মেয়েটির থেকে বশ্যতা দাবি করা হয়। শাশুড়ি বা স্বামী এমনকি ননদ অনুমতি দিলে সে নিজের মনোমত কাজটি করতে পারে। আর শাশুড়ি-ননদরা নারী হওয়া সত্ত্বেও সনাতন সংস্কার ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে তাদের 'সমাজনির্দিষ্ট ভূমিকা' জেনে বা না জেনে পালন করে যান।

আসল কথা লেখক আজকের সময়ের প্রেক্ষিতে মধ্যবিত্ত অর্থনীতি এবং পারিবারিক জীবনে conflicting aspiration-এর টানাপোড়েনটিকে ব্যাখ্যা না করে এবং সেখানে নতুন সম্পর্কসূত্র তথা মূল্যবোধের সন্ধান না দিয়ে সমস্যাটিকে শাশুড়ি-ননদ বনাম বউ এই সংঘাত হিসেবে দেখেছেন। আসলে হত্যা বা আত্মহত্যার পুরোচনা দানের পেছনে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংস্কারের খেলাটা লেখক দেখতে পাননি।

মিনতি কুণ্ডু
বর্ধমান

স্বাধীনতা নয়, চাই মানসিক শান্তি

১ – ১৫ মার্চ সংখ্যায় সুকন্যায় প্রচ্ছদ কাহিনী সব বধূকেই কি পুড়িয়ে মারা হচ্ছে ? – এবং সামঞ্জস্য বিধানে সম্পাদকীয় 'শুধু স্ত্রী স্বাধীনতা নয়, চাই নারী জাগরণ' – পড়লাম। লেখাগুলি নারী সমাজ তথা বিদগ্ধ মহলে সমালোচিত হলে সুকন্যায় এ রচনা প্রকাশের সার্থকতা। বর্তমান নারী স্বাধীনতা, নারী প্রগতি কথাগুলি প্রায়ই শুনতে পাই। জানি না কজন নারী এই শব্দগুলির গভীরে প্রবেশ করেছেন। আর নারী নির্যাতন ও বধূ হত্যা প্রসঙ্গেই ওঠে। বলতে পারেন কজন নারীর মধ্যে আজ সহযোগিতা, মানিয়ে চলার ক্ষমতা, রুচিবোধ, শ্রদ্ধা ও মাতৃভাব পরিলক্ষিত হয় কিন্তু এইসব গুণ একজন পূর্ণ নারীর অলংকার। একদিকে নারীর মধ্যে এই সব যেমন কমছে অপরদিকে হিংসা, হীনমন্যতা, উচ্ছৃংখলতা ও ব্যভিচারের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। রক্ষণশীল ছাড়াও সাধারণ পরিবারের লোকেরা এই সব মন থেকে মেনে নিতে পারে না। আর তখনই দাম্পত্য জীবনে চিড় ধরে এবং সুখের সংসারে আগুন জ্বলে। যার চরম পরিণতি মৃত্যুবরণ। ব্যক্তিগত অধিকার আদায়ের স্বাধীনতার চেয়ে মানসিক স্বাধীনতা অর্জনে সচেষ্ট হলে সুখের সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যাবে। সমস্যার আগে কারণ উদ্ভবকে নির্মূল করতে হবে। তাই স্বাধীনতা নয় মানসিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করার দাবি তুলুক মহিলা সমাজ।

মানস কুমার চিনি
মেচেদা, মেদিনীপুর

মিতাক্ষরা সম্প্রদায় নয়

'নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতা' রচনাটির লেখক নিরঞ্জন হালদারের বক্তব্য তথ্যের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। তিনি রচনাটিতে কি বলতে চান বুঝে ওঠা কঠিন ব্যাপার। বিদ্যাসাগর, রামমোহন থেকে মহারাষ্ট্রের জ্যোতিবা ফুলে প্রসঙ্গে আলোচনায় অনেক কথা অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু নারীমুক্তির মূল সমস্যাগুলি খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি। তিনি একজন সাংবাদিক, তাঁর পক্ষে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারাটি বোঝা উচিত। শুধু তথ্যপঞ্জী দিলেই কি কোন বক্তব্যে পৌঁছান সম্ভব ? এছাড়া ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তার ধারণা যে খুব স্পষ্ট নয় – তা তাঁর একটি মন্তব্যে ধরা পড়ে। তিনি লিখেছেন, 'ভারতেও হিন্দু সমাজের মিতাক্ষরা সম্প্রদায়ের মহিলারা 'স্ত্রীধনে'র অধিকারী......।' নিরঞ্জনবাবু আপনি এত কিছু জানেন, এটা জানেন না, মিতাক্ষরা সম্প্রদায় নয়, এটি একটি ভারতীয় আইনী ব্যবস্থা। দায়ভাগ ও 'মিতাক্ষর দুই ভিন্ন আইনী ব্যবস্থায় ভারতীয় সমাজ শাসিত। ইংরাজও প্রাচীন এই আইনীব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। আজও এই প্রথা ভারতীয় সমাজজীবনে প্রচলিত আছে। সম্প্রদায় হয় অন্য ভাষাগোষ্ঠী বা ধর্মগোষ্ঠীর মানুষদের।

সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
বরাহনগর

সমরেশ বসু বিরল প্রতিভাই নয়, অনন্য এক পৌরুষের নাম



এবারের সম্পাদকীয় লেখার জন্যে কলম হাতে নিতে অনিবার্য কারণেই যে কথা অন্যান্য বিষয়কে ছাপিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, তা হল, কথা সাহিত্যিক সমরেশ বসুর আকস্মিক প্রয়াণ। মৃত্যুর আগে তিনি কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন, একথা আমরা জেনেছি। সেদিক থেকে এ ধরনের ঘটনাকে হয়তো আক্ষরিক অর্থে আকস্মিক বলা যায় না। কিন্তু আমরা একে আকস্মিক বলছি অন্য কারণে। সমরেশবাবু এর আগেও একাধিকবার অসুস্থ হয়েছেন, এমন কি তাঁকে বাড়ি থেকে সরিয়ে নার্সিং হোমেও রাখতে হয়েছে, শুনেছি। কিন্তু প্রতিবারই এই জীবনসংগ্রামী মানুষটি শুধু সুস্থ হয়েই আমাদের মধ্যে ফিরে আসেননি, আবার নতুন প্রেরণায় কথাসাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন দিগন্ত উন্মোচন করে প্রমাণ দিয়েছেন, নিয়তির কড়া অনুশাসনেও তাঁর সাহিত্যাভিযানের স্পৃহা কিছুমাত্র কমে যায়নি। জীবনের শুরু থেকেই নানান বাধা ও বিপর্যয়ের মধ্যেও স্থির থেকে, আত্মবিশ্বাসী থেকে, প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত তিনি তাঁর সৃজনশীলতাকে এতটাই সজীব রেখেছিলেন যে, আমরা প্রায় নিশ্চিত ছিলাম, আধুনিক জীবনযাপন ও সভ্যতার আরো অনেক জট তিনি আমাদের খুলে দেখাবেন, আমাদের আপাত পরিচিত পারিপার্শ্বিক ও মানুষজনের মধ্য থেকে তিনি আরো অনেককাল তুলে আনবেন এমন সব চরিত্র, যা শুধু চমকিত নয়, আমাদের ভাবনা চিন্তায় নবমূল্যায়নের তরঙ্গ তুলবে। এমন একটা নিশ্চিত বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে তিনি চলে গেলেন বা তাঁকে চলে যেতে হল অকালেই। এই যাওয়া আকস্মিক আমাদের কাছে সেই কারণেই।

এই পৃথিবীতে জন্ম যার আছে, সে যে মৃত্যুহীন নয়, তা আমরা জানি। জন্ম মৃত্যুর এই লীলার মধ্যেই তো কাল থেকে কালান্তর তথা সভ্যতার বিবর্তন ঘটছে। কিন্তু এই বিবর্তনের মধ্যেই কখনো কোনো 'জীবন' আর সাধারণের মত কালস্রোতে বিস্মৃত, বিলীন না হয়ে, ইতিহাসের এক একটি অধ্যায় রচনা করে। সমরেশ বসুর জীবন (১৯২৪-'৮৮) আমাদের কাছে সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতা

সমরেশ বসু তাঁর জীবনকালের তুলনায় বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্টই সমৃদ্ধ করেছেন, একথা আজ বলাই বাহুল্য। সমসাময়িককালের অন্যান্য ক্ষমতাবান লেখকেরাও তাঁর সৃজনশীলতার প্রতি বরাবর সম্ভ্রম প্রকাশ করে এসেছেন। এটা বিরল দৃষ্টান্ত। একই সংগে বিতর্কিত, আবার বিমিশ্র পাঠক সমাজে পঠিত তাঁর সাহিত্য নিয়ে কোনো মন্তব্য এই নিয়মমাফিক সম্পাদকীয় পরিসরে করা উপযুক্ত হবে না, তবু এই মুহূর্তে অবশ্যই মনে পড়ছে, তাঁর সব ফসলই আমাদের সমাজের সকলে সর্বদা অসন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করেননি। এমন কি, সাহিত্যকে তিনি কলুষিত করেছেন –এমন অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে তাঁকে আদালতে গিয়েও দাঁড়াতে হয়েছে। এ সত্ত্বেও তিনি তাঁর বিশ্বাস বা দৃষ্টিভংগী থেকে বিন্দুমাত্র যে সরে আসেননি এর একমাত্র কারণ শেষ পর্যন্ত কোনো মতবাদে নয়, ভালো মন্দের মানুষের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর সৃষ্টির আকর্ষণ ও প্রেরণা।

সাধারণ সমাজের এক আপাত সাধারণ ছেলে, যিনি স্কুল জীবনের পড়াশোনাও শেষ করেননি, ছোটবেলা থেকে শুধু সাহিত্যে নয়, ছবি আঁকা, গান গাওয়া কিংবা অভিনয়ে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যাঁকে শেষ পর্যন্ত কমিশনে ডিম বিক্রি করে প্রায় কৈশোরেই দাম্পত্যজীবন শুরু করতে হয় বাল্যে বিবাহিতা অথচ স্বামী অত্যাচারে নিঃসংগ হয়ে যাওয়া এক তরুণীকে পূর্ণ জীবনের মর্যাদা দিতে, – তিনি যে নিয়ম মানার লোক নন, নিয়ম ভাঙারই মানুষ, তা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু এই নিয়ম ভাঙার মধ্যেও জীবন সম্পর্কে সমরেশ বসুর ছিল এক অতলস্পর্শ আগ্রহ ও অন্বেষা। বলাবাহুল্য, এই আগ্রহ ও অন্বেষাই তাঁকে 'নেই জগতের' উপেক্ষা থেকে 'আছে জগতের' সম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। একে কেউ বলবেন প্রতিভা, কেউ বলবেন পৌরুষ। আমরা মনে করি দুই-ই। কালের কাছে জীবনের নিশ্চয়ই ইতি ঘটে। কিন্তু প্রতিভা এবং পৌরুষই থাকে অক্ষয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি। □

কুমারী মাতৃত্ব

কুমারী-মাতৃত্ব কোনো নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু ভারতে এর সরকারি স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। পৃথিবী জুড়ে কুমারী মায়ের সংখ্যা বাড়ছে। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। কেন এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান ? এর ফলে সমাজের কী ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে ? ভারতের মত রক্ষণশীল সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই সরকারি স্বীকৃতিকে কী চোখে দেখছেন, তারই অনুসন্ধান করেছেন সুমন গুপ্ত



মা বাবার সংগে নিউ-ইয়র্ক থেকে মেয়েটি যখন প্রথম কলকাতায় এল, ওর বয়স তখন পনেরো। সদ্য ফোটা ফুলের মত তরতাজা, প্রাণচঞ্চল। ওর বাবা দেশে ফিরে এলেন পাকাপাকিভাবে। বাড়ি করলেন নিউ আলিপুরে। কাছাকাছি একটি স্কুলে ভর্তি করলেন মেয়েকে। স্কুলে যাতায়াতের পথে একটি ছেলের সংগে পরিচয় হল মেয়েটির। ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। পশ্চিমী আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা কিশোরী। এদেশের আর পাঁচটা মেয়ের থেকে ওর দৃষ্টিভংগি, ধ্যান-ধারণা অন্যরকম হবে বৈকি। খুব সহজে, জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ মেনে ওরা শারীরিকভাবেও ঘনিষ্ঠ হল। কিছুদিন পর মেয়েটি বুঝল, ও মা হতে চলেছে। ছেলেটিকে সে কথা জানিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিল। কিন্তু 'এ বিয়ে অসম্ভব' বলে ছেলেটি ফিরিয়ে দিল ওকে। বাবা মা এ ঘটনা জেনে আবরশন করিয়ে দিতে চাইলেন। মেয়েটি রাজি হল না কিছুতেই। স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল। সধবার মত শাঁখা-সিঁদুর পরল বাবা-মার হাজারো যুক্তির সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটির একটিই কথা : আমি মা হতে চাই।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তার দেখানোর নাম করে নিয়ে গিয়ে বাবা মা ওর আবরশন করালেন। ব্যাপারটা যখন ও বুঝতে পারল, তখন সব শেষ। মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেল মেয়েটি।

এ ঘটনার পর এক বছর কেটে গেছে। এখনও মেয়েটি স্বাভাবিক হতে পারেনি। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ও যেন বোবা হয়ে গেছে। শুধু ওর চোখের ভাষা বলে দেয় ওর সন্তানের ঘাতকদের ও কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

□

ভদ্রমহিলার বয়স বছর চল্লিশ। স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে ঘরকন্না করছেন। স্বামী খ্যাতনামা শিল্পী। জীবনের এই পর্বে পৌঁছতে অনেক চড়াই উতরাই পেরোতে হয়েছে ভদ্রমহিলাকে।

জন্মেছিলেন কুমারী মায়ের গর্ভে। যাঁর ঔরসে জন্ম, তিনি কিন্তু দায় অস্বীকার করেননি। বিয়েও করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে বউ করে ঘরে তুলতে চাননি ছেলেটির বাবা-মা। বিবেকের দংশনে আত্মহত্যা করল ছেলেটি। অদম্য মনোবল আর মানসিক স্থৈর্য নিয়ে সবরকম প্রতিকূলতার সংগে লড়াই করে সন্তানের জন্ম দিল কুমারী মা। এবার এগিয়ে এলেন মেয়েটির বাবা। স্নেহ-মমতা এবং আর্থিক-সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে বাঁচালেন দুটি জীবন। নিজের পদবী নাতনির নামের সংগে জুড়ে ভর্তি করালেন স্কুলে। স্কুলের পর কলেজ। তারপর বিয়ে। পাত্রপক্ষকে সব ঘটনা জানিয়েই নাতনির বিয়ে দিয়েছিলেন।

এরপর কেটে গেছে অনেকদিন। দাদু বেঁচে নেই। মা এখনও আছেন। আর আছে শৈশব-কৈশোরের অজস্র স্মৃতি। নিভৃত মুহূর্তের নিত্য সহচর।

□

ঢাকুরিয়াবাসী ছেলেটির সংগে যাদবপুরের মেয়েটির প্রথম আলাপ কাশ্মীরে। কাশ্মীরের আলাপ গাঢ় হয়েছিল কলকাতায়। মেয়েটির শ্যামলা রং, সুশ্রী চেহারায় একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। ছেলেটির অনুরোধে মেয়েটি প্রায়ই যেত ওর ঢাকুরিয়ার বাড়িতে। ছেলেটির মা ছাড়া আর কেউ সে বাড়িতে না থাকায় ওদের অবাধ মেলামেশা চলতে লাগল। মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হল। ছেলেটি ওকে সংগে করে নিয়ে গিয়ে একটি ক্লিনিকে আবরশন করাল। এরপর আরও পাঁচবার এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি। পঞ্চমবার ক্লিনিক থেকে আর ফেরা হল না মেয়েটির। দুর্বল শরীর রক্তক্ষরণের ধকল আর সইতে পারল না। নিয়মমাফিক পুলিশ কেস হল। জল ঘোলা হল কিছুদিন। তারপর নিয়মমাফিক একদিন সব ধামাচাপাও পড়ে গেল।

মমতা ব্যানার্জি

(এম. পি)



আমাদের দেশের মেয়েরা নানাভাবে নানাদিক থেকে উন্নতি করছেন। পুরুষদের সংগে সমানতালে পা ফেলে চলছেন। ইউরোপ আমেরিকার সোসাইটিতে মেয়েদের যে স্বাধীনতা তা এদেশের মেয়েরা এখনও পাননি। একটা দিকে মেয়েদের বিশেষ করে অবিবাহিতা মেয়েদের অবশ্যই চোখ-কান খোলা রেখে এগোন ভাল। ছেলেদের সংগে খোলামেলাভাবে মেলামেশা করে গর্ভবতী হয়ে যাবার ব্যাপারটা আমি কিছুতেই মেনে নেব না।

এমনিতে কুমারী মাতৃত্বের কোনরকম সামাজিক স্বীকৃতির পক্ষে আমি নই। তবে কোন মেয়ে নিতান্ত বাধ্য হয়েই যদি সন্তান প্রসব করে এবং সেই সন্তানকে সংগে করে সমাজে ফিরতে চায়, চায় আরও দশজন মায়ের মতো সামাজিক জীবন যাপন করে সন্তান বড় করে তুলতে, তবে ওই কুমারী মার চাওয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই। বাঁকা চোখের চাউনি নয়, তখন সেই মা ও তার সন্তানের প্রতি সমাজের পূর্ণ সহানুভূতিই তাদের বাঁচার একমাত্র রসদ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সবাইকে কুমারী মা ও তার সন্তানকে খোলা মনে মেনে নিতে হবে।

নবনীতা দেবসেন

(লেখিকা)



না....না..... তিনি এর মাতৃত্ব কোন অবস্থাতেই ভাল নয়। কোন অবস্থা বলতে বিয়ের আগে বা বিয়ের পরে। অবিবাহিতা অল্পবয়সী মেয়ের মাতৃত্ব এদেশে কেন, কোন দেশেই সংগত নয়। সংগত নয় বলার থেকে মংগলজনক নয় বলাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত। যথেষ্ট ক্ষতিকর মায়ের স্বাস্থ্যের পক্ষেও, শিশুর বড় হবার পক্ষেও।

গর্ভপাত আইন সিদ্ধ হবার পর মায়েরা বাঁচছে। আর এটা আইনসিদ্ধ হবার জন্য দেশের মেয়েদের চরিত্রদোষ বেড়ে গেছে – আমি তা একদমই মনে করি না। একবার ভুলভ্রান্তি ঘটে গেলে সেই মেয়ের জীবনে আর ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ হতো না আগে। এখন হয়। আগে আত্মহত্যা করত। এখন করে না। বৃহত্তর দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে দেখতে গেলে বলব কুমারী মাতৃত্বের জন্য সেই অল্পবয়সী মেয়েটি একাই দায়ী নয়, দায়-দায়িত্ব মেয়েটির মা-বাবারও আছে, গোটা সমাজের আছে। আচ্ছা একটা কথা, সবাই কুমারী মাতৃত্ব নিয়েই বলাবলি করেন, কিশোর যদি বাবা হয় সেটাই কি খুব সুবিধেজনক? সে কি তার সন্তানকে খাইয়ে পরিয়ে বড় করে তুলতে পারবে? সোজা কথা হল, অসুবিধেটা ছেলে বা মেয়ের ক্ষেত্রে আলাদা করে নয়, কিশোরী মা বা কিশোর বাবা নয়, অসুবিধে হবে সামাজিক মূল্যবোধেরই।

মুনমুন সেন
(চিত্রাভিনেত্রী)



কুমারী মাতৃত্ব আমাদের সমাজ মেনে নেয় না। আমার মনে হয় কুমারী মাতৃত্বের ব্যাপারটা কারো পক্ষেই খুব সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে অবিবাহিতা মেয়েদের মাতৃত্ব নিয়ে হৈচৈ চলবেই। এমনিতে মেয়েদের গর্ভপাত করাটাকে আমি তেমন ভাল চোখে দেখি না। এটা একধরনের হত্যাকাণ্ডও বটে। কিন্তু যে সমাজে কোন কুমারী মা তার সন্তানসহ বেঁচে থাকার অধিকার পান না, সে সমাজে গর্ভপাত একটা সোসাল ক্রাইম এটা জেনেও মেয়েরা বাধ্য হন হাসপাতালে বা ক্লিনিকে গিয়ে গর্ভপাত করাতে। ছেলেদের দেখানো নানা প্রলোভনে দেহ ও মন দিয়ে মেয়েদেরকেই তো ঠকতে হয় শেষমেশ। তবে এটাও হয়তো কিছুটা ঠিক যে অনেক কুমারী মেয়েই আজকাল দৈহিক মিলনের ব্যাপারটাকে একটা 'গেম' হিসেবে নিচ্ছে। এরপর পেটে সন্তান আসছে। আর লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে ছুটে যাচ্ছে গর্ভপাত করাতে।

অনেকেই হয়তো প্রশ্ন তুলবেন, ভবিষ্যতে অবিবাহিতা মায়ের সন্তানের পরিচয় কি হবে? অনেকে আগ বাড়িয়ে বলবেন, পিতৃহীন সন্তান বড় হয়ে ওর মায়ের দিকেই যখন আঙ্গুল তুলে জানতে চাইবে কেন তাকে জন্ম দেওয়া হল, পিতার পরিচয় ছাড়া কেন তাকে বেড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হল, তখন কি হবে? প্রশ্নের উত্তরে বলব, মায়ের পরিচয়েই সন্তান তার পরিচিতি পাবে। বাবার পরিচয়টাই কি শেষ কথা? মেয়েদের জীবন এমনিতেই প্রতি পদে পদে দুঃখময়, হাজারো সমস্যা আর তির্যক চোখের আঁচ বাঁচিয়ে মেয়েদের চলতে হয়। ভবিষ্যতে কুমারী মা ছেলের মুখোমুখি না হয় হলই।

ভারতী রায়চৌধুরী (চাকী)
(অধ্যাপিকা, রামমোহন কলেজ)



ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশার ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করি না। আজ খুব বেশি করে দেখা যাচ্ছে অবিবাহিতা মেয়েরা ছেলেদের সংগে অবাধে মেলামেশা করছে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। গর্ভবতী হচ্ছে অবিবাহিতা মেয়েরা। আমার মনে হয় ছেলেদের সংগে মেলামেশায় এদের কোনরকম মানসিক প্রস্তুতি নেই। মানসিক প্রস্তুতি বলতে 'কমিটেড লাভ' এর কথাই বলছি। একটি মেয়ে একটি ছেলেকে যদি সত্যিই ভালবাসে, ভবিষ্যতে বিয়ে করতে পরস্পরের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, তবে এদের মেলামেশাকে খারাপ চোখে দেখার কোন কারন নেই। ইচ্ছাকৃত কুমারী মাতৃত্ব সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট করবে বলেই আমি এর বিরুদ্ধে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং-এর মেয়েটির বর্তমান ঠিকানা কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের এক পতিতালয়। ১৯ বছরের মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন বাবা-মা। অপরাধ, এক বিবাহিত পুরুষের সংগে শারীরিক সম্পর্কের ফলে মেয়েটি মা হতে চলছিল। এবং যথাসময়ে পুরুষটি তার সব দায় অস্বীকার করেছে।

□

কলকাতার ক্রিস্টোফার রোডের এক নিম্নবিত্ত পরিবার। চার ছেলে, দুই মেয়ে ও স্বামী-স্ত্রী – আটজনের সংসার চালাতে হিমসিম খেয়ে যান পালবাবু। এই পরিবারেরই ছোট মেয়েটি একদিন অঘটন ঘটিয়ে ফেলল। ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল পাড়ারই একটি ছেলের সংগে। ব্যাপারটা মায়ের চোখে যখন ধরা পড়ল, তখন চার মাস। মাথায় যেন বাজ পড়ল। শেষ পর্যন্ত মেয়েকে এনে নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলেন। অ্যাবরশনের পর মেয়েটি সুস্থ শরীরেই ফিরে গেছে বাড়িতে।

□

কুন্তী, জবালা কোনো বিশেষ যুগের চরিত্র নয়। সর্বযুগের, সর্বকালের। চরিত্রের নাম বদলায়, বদলে যায় সামাজিক চালচিত্র। কিন্তু মূল কাঠামো একই থাকে। কর্ণেরা এখন গংগার জলে ভাসে না, পড়ে থাকে আস্তাকুঁড়ে। অধিরথের আশ্রয়ের অভাবে বেড়ে ওঠে মাদার তেরেজার অনাথ আশ্রমে। তার কারণ, কানীন পুত্রকে মহাভারতের সমাজ যে চোখে দেখত, বিংশ শতাব্দীর সমাজও প্রায় সেই চোখেই দেখে। সময়ের ব্যবধান দুস্তর, দৃষ্টিভংগির পার্থক্য যৎসামান্য। আজকের কুন্তীরা ভ্রূণ হত্যা করে কলংক থেকে মুক্তি পান, মহাভারতের কুন্তীর সে সুযোগ না থাকায় তিনি প্রসবের পর সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে কলংক থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলেন। তবে আশার কথা এই লক্ষে একজন হলেও সত্যকামের মা জবালা আজও আছে। সব প্রতিকূলতার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তারা সত্যকে স্বীকার করে, অন্ধকারের বুক চিরে জন্ম দেয় আলোর। ১৯৭১-এ ভারতে এম টি পি অ্যাক্ট চালু হয়েছিল। এম টি পি অর্থাৎ মেডিক্যাল টার্মিনেশন অব প্রেগন্যান্সি। অ্যাবরশন তখন থেকেই আইনের স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু আইনত সিদ্ধ এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে অদ্ভূত এক গোপনীয়তা রক্ষার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে অবিবাহিতাদের ক্ষেত্রে। এম টি পি অ্যাক্টের ধারায় কোথাও কিন্তু উল্লেখ নেই, এই আইন বিবাহিতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এতে বলা হয়েছে, (১) গর্ভবতী মহিলা মানসিক ও শারীরিক কারণে গর্ভপাত করাতে পারেন; (২) কোন ধর্ষিতা মহিলা রেজিস্টার্ড ক্লিনিক বা হাসপাতালে গিয়ে ভ্রূণমোচন করাতে পারেন; (৩) গর্ভের সন্তান বিকলাংগ হবার সম্ভাবনা থাকলে গর্ভপাত করানো যেতে পারে; (৪) জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বনের পরও যদি কেউ অন্তঃসত্ত্বা হন, তিনি ভ্রূণমোচন করাতে পারেন। সুতরাং বিবাহিতা-অবিবাহিতা নির্বিশেষে আইনটি প্রযোজ্য। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ কুমারী মাতৃত্বকে মানতে পারে না কিছুতেই। তাই এমন গোপনীয়তার ঘেরাটোপ।

অনেকের ধারণা এম টি পি অ্যাক্ট কুমারী মেয়েদের বিশেষ করে কিশোরীদের বেপরোয়া করে তুলেছে। অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে রেহাই পাওয়া কোনো কঠিন ব্যাপার নয়, এটা বুঝে অনেকেই ব্যাভিচারিণী হয়ে উঠেছে। সরকারি হাসপাতাল থেকে শুরু করে ছোটখাট ক্লিনিক এবং প্রাইভেট নার্সিং হোমে অল্পবয়সী মেয়েদের অ্যাবরশন করানোর হার যেভাবে বাড়ছে তাতে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ক্লাস সিক্স সেভেন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ভিড় এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বত্র।

'ক্যালকাটা পলি ক্লিনিক'-এর স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস কে সামন্তর কাছ থেকে এই প্রতিবেদক জানতে পারলেন, ডাঃ সামন্ত গড়ে মাসে প্রায় ১০০টি অ্যাবরশনের কেস করেন। তার মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ বিবাহিতা মহিলা। আর সন্তান চান না বলে এঁরা অ্যাবরসন করান। বাকি ৪০ শতাংশ অবিবাহিতা এবং অধিকাংশই কিশোরী।

এম টি পি অ্যাক্টের ফলে অবিবাহিতা কিংবা কিশোরীদের ভিড় বাড়ছে, একথা ডাঃ সামন্ত মানতে রাজি নন। তাঁর মতে, এই অ্যাক্ট চালু হবার কয়েক বছর পরেও ক্লিনিক, নার্সিং হোম, হাসপাতালগুলোয় অল্পবয়সী মেয়েদের এত ভিড় ছিল না। এখন যে এর মাত্রা বেড়েছে তার কারণ টিভি, রগরগে সিনেমা, ব্লু ফিল্ম ইত্যাদি। এর জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে শহর, গ্রাম। তাছাড়া নানারকম কনট্রাসেপটিভ রয়েছে বাজারে। এসবের বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। কাজেই বর্তমান প্রজন্মের কাছে শরীরী সম্পর্ক কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই নয়। তা না হলে একটি মেয়ে এতবার অ্যাবরশনের জন্য ক্লিনিকে আসে! এতে যে কী মারাত্মক ক্ষতি হয় তা বার বার বোঝালেও ওদের শিক্ষা হয় না। কেঁদেকেটে বলে, 'ফিরিয়ে দেবেন না ডাক্তারবাবু। আপনি ফেরালে রেললাইনে মাথা দিতে হবে।' অগত্যা মানবিকতার তাগিদে কাজটা করি। কিন্তু ডাক্তার হিসেবে বুঝি, মেয়েটির কতটা শারীরিক ক্ষতি হল। আরেকটি ব্যাপারে সাবধান করলেন ডাঃ সামন্ত। বহু মহিলাই গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জন্য 'ইপি ফোর্ট' 'ওরাসেকরন ফোর্ট' ইত্যাদি ট্যাবলেট খান। এই ওষুধগুলো মারাত্মক। শরীরের ওপর নানান প্রতিক্রিয়া করে। তাই ওষুধগুলো বিদেশে 'ব্যানড'। আর এদেশের বাজারে সেগুলোর ঢালাও বিক্রি। লোকে কিনছেও আকছার। এ ব্যাপারে কারুর কোনো মাথাব্যথা নেই।

বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞা মেডিকেল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপিকা এবং প্রেসিডেন্সি সার্জেন ডাঃ অনিতা দত্তগুপ্তের মতে,আবরশনের ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। কলকাতার যে-কোনো হাসপাতালে গাইনোকলজি ডিপার্টমেন্টের আউটডোরে গেলেই এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। কেউ নিয়ে এসেছেন স্ত্রীকে, মার সংগে এসেছে ধর্ষিতা কুমারী মেয়ে, এসেছে সেই অবুঝ মেয়ে যে বিয়ের প্রলোভনে ছেলে বন্ধুটিকে দেহ দিয়ে প্রতারিতা হয়েছে। ডাঃ দত্তগুপ্ত জানালেন, এক বছরে মেডিকেল কলেজে ৬ হাজারের মত আবরশন কেস হয়। তার ৩০ শতাংশই কিশোরী মেয়ে। তাঁর মতে, এম টি পি অ্যাক্ট চালু হয়ে কত মেয়ের যে প্রাণরক্ষা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে দুঃখ এই, সবরকম সরকারি সহযোগিতার আশ্বাস থাকা সত্ত্বেও এখনও অনেকে হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছে। বিশেষ করে কুমারী মেয়েরা। এরা যখন প্রচন্ড 'ইনফেকশন' নিয়ে সরকারি হাসপাতালের দ্বারস্থ হয়, তখন আর কিছু করার থাকে না।

বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে কুমারী মাতৃত্বের হার বাড়ছে দ্রুতগতিতে। এর মধ্যে কিশোরীর সংখ্যাই বেশি। এই তালিকায় প্রথম স্থানটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এরপর ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, সুইডেন ও হল্যান্ডের স্থান। ভারত রয়েছে তালিকার শেষাশেষি। কিশোরীদের মাতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে থাকলেও, আবরশনের তালিকায় প্রথম স্থান সোভিয়েত রাশিয়ার। ওখানে প্রতি হাজারে ১৮০ জন কিশোরী ভ্রূণমোচন করায়। জাপানে এই সংখ্যা প্রতি হাজারে ৮৪ জন, আমেরিকায় ২৯ জন এবং ভারতে ৬ জন। যুগোশ্লাভিয়ায় যে বছর ৫০ হাজারের মত আবরশনের ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে ১৫ হাজার ছিল কিশোরী। ২ কোটি মানুষের দেশ রুমানিয়ায় ৪০ বছরের নিচে কোনো মহিলার অ্যাবরসন করানো আইনের চোখে দন্ডনীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে বছরে ১২ লক্ষ অ্যাবরশনের ঘটনা ঘটে। আর সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সী মহিলাদের আবরশনের ঘটনা বছরে এক

মৌসুমী সেনগুপ্ত

(গৃহবধূ)



কুমারী মাতৃত্ব নিয়ে আজকাল খুব হৈচৈ হচ্ছে। এটা কিন্তু কিশোরীদের ঠান্ডা মাথায় তৈরি করা কোন সমস্যা নয়। নানাবয়সী ছেলের সংগে খোলামেলাভাবে মেশার ফলে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে এবং অল্পবয়সী মেয়েরা গর্ভবতী হচ্ছে। এভাবে গর্ভবতী হবার হাত থেকে বাঁচতে গেলে কি কি কারণে এটা হতে পারে তা মেয়েদের জানা প্রয়োজন। মেয়েকে সঠিক বুদ্ধি ও পরামর্শ দিতে পারেন তার মা বা দিদি। আমাদের সমাজব্যবস্থা যা, তাতে কুমারী মাতৃত্বকে কেউ ই মেনে নিতে পারে না। তবে কোন কুমারী মা যদি তার সন্তানকে মানুষ করতে চান তাকে সেই সুযোগ আমাদের দেওয়া উচিত। এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই।

রুমা রায়চৌধুরী

(কলকাতা, তৃতীয় বর্ষ ইংরেজি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)



কুমারী মাতৃত্ব বাঞ্ছনীয় নয় বলেই মনে করি। মেয়েদের কথা ভেবেই এটা বলছি। হাতকাটা ব্লাউজ বা একটু আঁটোসাঁটো পোশাক পরে কোন মেয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে তাকে আজকেও দিনেও অনেক টিটকিরি হজম করতে হয়। যেখানে এই অবস্থা, সেখানে কোন কুমারী মা যদি তার সন্তানকে নিয়ে সমাজে ফিরতে চায়, আমাদের এই সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ কি তা হতে দেবে ? দেবে না, বরং মা ও তার সন্তানের দিকেই আঙুল তুলবে।

রীণা নাগ

(স্কুল শিক্ষিকা)



সামাজিক কারণেই কুমারী মাতৃত্ব সংগত নয়। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই সামাজিক মূল্যবোধ পাল্টায়। তবে এই মূল্যবোধের অবক্ষয় যেন না হয়। কুমারী মাতৃত্ব কিন্তু এই অবক্ষয়কেই ডেকে আনবে। তাই কোন অবস্থাতেই কুমারী মাতৃত্বকে উৎসাহিত করা উচিত নয়। কুমারী মেয়েদের বাধাহীন মেলামেশা যত কম হয় ভাল। জনসংখ্যার হার ঠেকানর জন্য সরকার গর্ভপাতকে আইনসম্মত করেছেন। যেসব বিবাহিতা রমণী সন্তান আর চান না গর্ভপাত তাদের জন্যই দরকার। কুমারীরা এই সুযোগটা পেয়ে অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রে আরও সাহসী ও উৎসাহী হয়ে উঠছে। অনেকে কুমারী মাতৃত্বের জন্য ছেলেদের একতরফাভাবে দায়ী করেন। দায়ী যে আসলে কে তা ঠিক করা খুব কঠিন ব্যাপার।

একটা হত্যাকান্ড নয়, ঘটল আরও একটা হত্যাকান্ড : মাদার তেরেজা



আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোডের ওপর ছাইরঙা চারতলা বিশাল বাড়ি। বাইরে যখন অজস্র কোলাহল, ওই বাড়ির ভেতর তখন আশ্চর্য রকমের শান্তি। অথচ বিশাল কর্মযজ্ঞ চলেছে ওরই ভেতর। বাইরে থেকে বোঝা যায় না এতজন সন্ন্যাসিনী এখানে থাকেন, যাঁরা সকলেই এই কর্মযজ্ঞের শরিক। আর যজ্ঞের হোতা সেই মহীয়সী, যিনি আর্তের পরিত্রাতা, দুঃখীর সহায় – মাদার তেরেজা।

'কুমারী-মাতৃত্ব' সম্পর্কে মাদার তেরেজার অভিমত জানতে চাওয়ায় বললেন, 'যত দিন যাচ্ছে সমাজজীবন ততই কঠিন, কঠোর হয়ে উঠছে। সেই সংগে হারিয়ে যাচ্ছে 'স্যাকরেডনেস' অর্থাৎ পুণ্যবোধ। পুণ্যবোধ বলতে শুধু ঈশ্বরের প্রতি ভয় ভক্তিই নয়। পুণ্যবোধ আসে নানাভাবে। কারুর জন্য ভাল কিছু করে, দুঃখী-আর্তের সেবা করে, সমাজের নানারকম অত্যাচার-অবিচার, কুসংস্কার, অসামাজিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে এবং এসবের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে। আমার মতে চুরি, ডাকাতি, খুন যেমন অসামাজিক কাজ, অ্যাবরশন করানোও তেমনি। মায়ের পেটে যে শিশুটি তিল তিল করে বেড়ে ওঠার প্রতীক্ষায়, অ্যাবরশন করিয়ে তাকে মেরে ফেলা তো স্যাকরেডনেসকে মেরে ফেলারই নামান্তর। জেনে শুনে এই হত্যাকান্ড যে ঘটায়, তার কোনো ক্ষমা নেই।'

মাদার তাঁর বক্তব্যে বারবারই 'ফ্রুট অব ইমমর‍্যালিটি'র কথা বললেন। তাঁর মতে, 'ফ্রুট অব ইমমর‍্যালিটি'র স্বাদ পাওয়ার একটা ছোঁয়াচে উন্মাদনা এখন ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবার মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এম টি পি অ্যাক্টের তীব্র বিরোধিতা করে মাদার বললেন, 'এই অ্যাক্ট অ্যাবরশনকে আইনের স্বীকৃতি দিয়েছে। এতে অবিবাহিতা গর্ভবতী মেয়েদের আত্মহত্যার ঘটনা বন্ধ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মেয়েদের মর‍্যালিটি শেষ হয়ে যেতে বসেছে। দা টিন-এজারস হ্যাভ লস্ট দেয়ার সেলফ কন্ট্রোল। এই অ্যাক্ট বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, সব মেয়েদের সর্বনাশ করছে। বিশেষ করে অল্পবয়সী মেয়েরা সংযমের বাঁধ ভেঙে অবাধে দৈহিক সম্পর্কের জোয়ারে গা ভাসাচ্ছে। অ্যাবরশন তো আজকাল কোনো ব্যাপারই নয়। সন্তান প্রয়োজন নেই চলে যাও অ্যাবরশন ক্লিনিকে। শুকনো মুখে গিয়ে, ফিরে এল হাসি মুখে। একটা হত্যাকান্ড নয়, ঘটল আরও একটা হত্যাকান্ড। গর্ভের ভ্রূণ হত্যা করে মেয়েটি তার বিবেক, মূল্যবোধ আর আত্মসম্মানবোধকে হত্যা করল।'

'মাতৃত্বের থেকে বড় আর কিছু এই দুনিয়ায় আছে কিনা বলতে পারি না। আমার মনে হয়, বিবাহিতা বা কুমারী যা-ই হোক না কেন, মাতৃত্বের জন্য প্রত্যেকেরই গর্বিত হওয়া উচিত। আমার বিচারে 'কুমারী মাতৃত্ব' এতটুকুও খারাপ নয়। আসল কথা 'কারেজ'। সন্তানকে নিয়ে মাথা উঁচু করে সমাজে বেঁচে থাকার সাহস ও মানসিকতা দরকার। একটি মেয়ে যদি পুরুষের সংগে অবাধে মিশতে পারে, দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে গর্ভবতী হতে পারে, অ্যাবরশন টেবিলে না শুয়ে সে কেন সুস্থভাবে সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না যে 'কারেজ' তাকে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের নিয়ম-নীতি ভাঙতে সাহায্য করল, গর্ভবতী হবার পর তা কোথায় উবে গেল আমি মনে করি, গর্ভস্থ সন্তানকে সুস্থভাবে ভূমিষ্ঠ করানোর সংসাহস যে মেয়ের নেই, নিয়ম ভেঙে শারীরিক সম্পর্ক ঘটানোর দুঃসাহস যেন সে না রাখে।

'আমাদের এই 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি'তে অনেক মেয়েই গর্ভবতী অবস্থায় আসে। আমি তাদের সাহস দিয়ে বলি, তোমরা সন্তান নষ্ট কোরো না। তোমরা যদি না চাও, আমাকে দাও। আমিই ওদের দেখব। আমার এখানে বহু কুমারী-মা সন্তান প্রসব করেছে। একদিন ভ্রূণ অবস্থায় যাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল, তাদের ফুলের মত মুখ আর স্বর্গীয় হাসি দেখে অনেক কুমারী মায়ের চোখেমুখে মাতৃত্বের মমতা ফুটে উঠতে আমি বার বার দেখেছি।'

ওঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে বললেন, 'মনে রেখ, দ্য গ্রেটেস্ট গিফটস অব গড টু ম্যানকাইন্ড আর হার্ট অ্যান্ড বডি, পিওরিটি অ্যান্ড গুডনেস। এদের মিলনেই মানুষের মনুষ্যত্ব গড়ে ওঠে। আজ এর অভাব বড় বেশি।' ❑

কোটিরও বেশি। এই ঘটনায় প্রমাদ গুনে সোভিয়েত সরকার বিবাহিতা অবিবাহিতা সব মেয়েদের কাছে আবেদন রাখছেন, ভ্রূণমোচন না করিয়ে তাঁরা যেন সন্তানের জন্ম দেন। কুমারী মায়েদের সন্তানদের সবরকম আর্থিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন সোভিয়েত সরকার।

অনেকে মনে করেন, দারিদ্র্য এবং সঠিক যৌন শিক্ষার অভাবে এদেশে অল্পবয়সী মেয়েরা অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায়ভাগী হয়। কিন্তু দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা বা অজ্ঞানতাই যদি কুমারী মাতৃত্বের কারণ হয়ে থাকে, তবে মার্কিন মুলুকে কিশোরী-মায়ের এত সংখ্যাধিক্য কেন সেখানে অর্থ এবং শিক্ষা কিছুরই তো অভাব নেই। আসলে মানসিকতা, মূল্যবোধ, ধ্যান ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। শরীরী আকর্ষণের সহজাত প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা না করে, স্বীকার করতে চাইছে বর্তমান প্রজন্ম। ভাববাদের ভাসমান জগৎ থেকে নেমে এসে ওরা পা রাখতে চাইছে বস্তুবাদের কঠিন মাটিতে। পশ্চিমী দুনিয়ায় বহু দেশ উদারভাবে মেনে নিচ্ছে কুমারী মাতৃত্বকে। কিন্তু এদেশে কুমারী মাকে স্বীকার করে নেওয়ার মত মানসিকতা এখনও তৈরি হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কুমারী মায়ের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার ঐকান্তিক ইচ্ছা কিংবা জেদই বড় কথা নয়। মূল ব্যাপার, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন। শেষ কথা, কুমারী মা ও তাঁর সন্তানের আর্থিক সামাজিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বোম্বাইয়ের একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিশেষ দপ্তরে 'মেটারনিটি লিভ'-এর দরখাস্ত জমা পড়েছে। আবেদনকারিণী অবিবাহিতা। ছুটি না মঞ্জুর হল না। কারণ, এই ছুটি বিবাহিতাদের প্রাপ্য। তিন মাস পর সন্তানের জন্ম দিয়ে মেয়েটি সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা রুজু করল হাইকোর্ট থেকে মামলা গড়াল সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল মেয়েটির পক্ষে। সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হল, 'মেটারনিটি লিভ' মঞ্জুর করে ওই সময়ের সমস্ত পাওনা-গন্ডা মিটিয়ে দিতে। নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। কারণ, এ ঘটনার কোনো পূর্ব নজির নেই।

মাস কয়েক আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পি চিদাম্বরম দেশের প্রতিটি সরকারি দপ্তরে এক নির্দেশ পাঠিয়ে জানিয়েছেন, এখন থেকে কুমারী মায়েরা 'মেটারনিটি লিভ' পাবেন। সুতরাং এতদিনে কুমারী মাতৃত্ব সরকারি স্বীকৃতি পেল।

মহিলাদের কল্যাণে নিয়োজিত 'উইমেন্স কো অরডিনেটিং কাউন্সিল'-এর লিগ্যাল সেল-এর ভারপ্রাপ্তা শ্রীমতী সুভদ্রা রায়চৌধুরী এই প্রতিবেদককে জানালেন : বিপন্ন মেয়েদের উদ্ধার করতে আমরা সবসময়ই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। বহু বিবাহিতা মহিলা স্বামী-পরিত্যক্তা হয়ে কিংবা নানা প্রতারণার শিকার হয়ে আমাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন। আমরা যথাসাধ্য তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু কোনো কুমারী মা এখনও পর্যন্ত সাহায্যের আবেদন নিয়ে আসেননি। যদি কেউ আসেন, আমরা সবরকম সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। এই সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখার্জিও একই কথা বললেন।

অচলায়তন টলেছে। একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে পুরনো সংস্কারের ভিত। ভাঙছে জীবনেরই প্রয়োজনে। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শ ছাড়া যেমন পাষাণী অহল্যার অভিশাপমুক্তি নেই, তেমনি বিয়ের শিলমোহর ছাড়া এতকাল কোনো মাতৃত্ব বৈধতার ছাড়পত্র পেত না। সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত মাতৃত্বের ওপর থেকে তুলে নিল সেন্সরশিপ। রূপ কিংবা রুপোর অভাবে যে মেয়ে বিয়ের হাটে বিকোলো না, সেও এখন মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে। নিজেকে এবং গর্ভের সন্তানকে প্রতিপালনের ক্ষমতা যদি সে রাখে তবে পুরুষের কৃপা প্রার্থনায় কেন সে নিজেকে পণ্য করে তুলবে তার চেয়ে জবালাপুত্র বলেই পরিচিত হোক না তার গর্ভের সত্যকাম। □

বেলা নন্দন

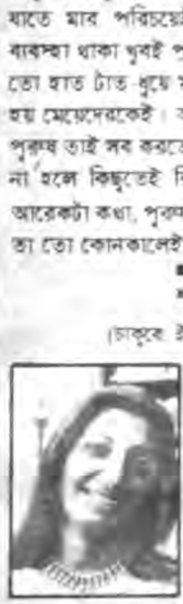
(৮১ বছরের বৃদ্ধা)



কুমারী মাতৃত্ব নিয়ে কি-ই বা বলব। আমরা তো সেকেলে মানুষ। অনিচ্ছাকৃত কুমারী মাতৃত্বকে এ সমাজের মেনে নেওয়াই উচিত। তবে একটা কথা এসে যায়, ভবিষ্যতে সন্তানের পরিচয় কি হবে। এটা যেহেতু মাতৃতান্ত্রিক সমাজ নয়, মার পরিচয়ে সন্তান বড় করে তুলতে নানাগুচ্ছের অসুবিধের মুখে পড়তে হবে সেই কুমারী মাকে। সন্তান যাতে মার পরিচয়েই বড় হয়ে উঠতে পারে সেই ব্যবস্থা থাকা খুবই প্রয়োজন। পুরুষদের আর কি, ওরা তো হাত টাত-ধুয়ে সরে পড়ে, যত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় মেয়েদেরকেই। আসল কথাটা হল, যেহেতু আমি পুরুষ তাই সব করতে পারি – পুরুষদের এ দেমাক দূর না হলে কিছুতেই কিছু হবে না। এটাই হক কথা। আরেকটা কথা, পুরুষ ও নারী যে অর্ধেক অর্ধেক সমাজ তা তো কোনকালেই মানছে না।

শম্পা দাশ

(চাকুরে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স)



কুমারী মাতৃত্ব বাঞ্ছনীয় নয়। তবে যে কুমারী মাতৃত্ব নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে একান্ত উপায়হীন ভাবেই ঘটে যায়, তাকে সকলের মেনে নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়। তখন মা ও তাঁর সন্তানকে পুরোপুরি সমবেদনা জানিয়ে তাদের সুস্থ পরিবেশে থাকার সুযোগ করে দেওয়াটাই ঠিক কাজ। আর এর ফলে সমাজের বিষম ক্ষতি হয়ে যাবে বলে যারা গলা চড়ান তাদের একধারে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে।

নন্দিতা চক্রবর্তী

(দশম শ্রেণীর ছাত্রী)



কুমারী মেয়েদের মাতৃত্ব নিয়ে প্রায় সবাই কমবেশি চৈ-চল্লা করেন। মুখে না বললেও এই বিষয়টি সম্পর্কে জানার আগ্রহ অনেকেরই। এটা যেন মুখরোচক কোন ব্যাপার। অথচ কি অবস্থায় আমাদের বয়সী মেয়েরা গর্ভবতী হয়ে পড়ছে সেই খোঁজখবর কজনে রাখতে চায়। কেউ ধর্ষিতা হচ্ছে, কাউকে বিয়ের রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে ঠকান হচ্ছে। ছেলেদের তো কোন ঝামেলা নেই। সব পোয়াতে হয় মেয়েদের। তাই কুমারী মাতৃত্ব ভালোর চেয়ে মেয়েদের অবস্থা খারাপই করবে বেশি। একেই তো আমাদের মেয়েদের হাজারো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, তার ওপর এ সমাজে কুমারী মা সন্তানসহ বসবাস করতে গেলে লোকে ছি ছি করে উঠবে। নতুন করে ঝামেলায় পড়ার দরকারটাই বা কি?

কবিতা



দর্পণের আলোয়

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

চিরকাল মুখ লুকোলে
ছায়ার ভিতরে

বৃক্ষের স্বভাব কিন্তু
সুনিশ্চিত বোঝনি কখনো।

যারা যাবার জন্যে আসে
তারা ঠিকই চলে যায়
কেউই আসে না নিয়ে
দীর্ঘ পরমায়ু

অথচ জীবন এক অদ্ভূত দর্পণ

এখনো নক্ষত্র জ্বলে সারারাত
তারপর ম্লান থেকে ম্লানতর হয়
ঘুণপোকা কুরে খায়
সূর্যের শরীর
পুরনো মানচিত্র দ্যাখো
নিয়ত পাল্টায়
স্বভাবের আশ্চর্য নিয়মে।

প্রতি পদক্ষেপে জেনো
তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী
নিত্যবহ তোমারই হৃদয়।

প্রাণভিক্ষা

শিশির ভট্টাচার্য

ওখানে কে দাঁড়িয়ে আছেন, সামনে আসুন!
আপনার মুখশ্রী দেখে নিই
কতখানি শীতার্ত হলে তবেই ডিম পাড়ে মৃত্যু
জীবনের ভেতর
কে বা কাহারা পিস্তল হাতে ছুটে আসে
দু-একটা ফায়ার হয়ে যায় অকস্মাৎ
দু-একটি মৃত্যু অকারণে অনিচ্ছায়,
ঝরা ফুলের মত অনাদরে পড়ে থাকে।

এইসব দিনরাত্রি বাসা বাঁধে বুকে
ঘুমের গভীরে কেবলই শীতের পিঁপড়ের মত
সারি সারি জীবনের চলা–
আন্দোলন – বিপ্লবের বিষয় – কোলাহল
চাঁদের নর ছায়া গংগার ঘোলা জলে
পাটকল চিমনির ধোঁয়ায় ভেসে গেছে
কতকাল আগে –

এখনো তবু রবীন্দ্রসংগীত
এখনো তবু নারীর প্রেম জেগে থাকে
এখনো তবু শীত আর উষ্ণতা মিলেমিশে
নতজানু হয়ে প্রাণ ভিক্ষা করে।

বৃক্ষের সমীপে

সন্ধ্যা দাস

আজন্ম ভিখারী আমি নতজানু হয়ে আছি বৃক্ষের সমীপে
বৃক্ষ কি দেবে কিছু? পত্র পুষ্প বিরল মহিমা
অলীক স্পর্ধা ঘিরে জন্ম নেবে শব্দের ঈশ্বর!

জানি না কী দেবে বৃক্ষ, তবু আমি একান্ত প্রত্যাশী
শব্দের শিকড় ছুঁয়ে বসে আছি আকাঙ্ক্ষা অস্থির
প্রতিমা শরীর পাবে – যদি বৃক্ষ প্রতিশ্রুতি রাখে।

সোনালি অতীত

মধুসূদন পাল

নদীর চেয়ে বহমান সবুজ লতাগুল্ম
মাথার খোকারে শিস নতজানু পাহাড়
শালিকের গায়ে ডালিমের সুবাস
বুকের ভেতর অনুক্ষণ
ধরে আছি এক যুবতীর লাশ
কৃষ্ণচূড়ার কাছে রেখেছি বন্ধক
সোনালি প্রেম আমার
সোনালি অতীত



ছবি : সোমেন মিত্র

বিশেষ রচনা



বালিকা বধূ না প্রসূতি বলি!

প্রবীর নিয়োগী

গৌরীদানের যুগ কি শেষ হয়ে গেছে? নাকি বিংশ শতকের ওপর-চটকে উনবিংশ শতকের সেই অন্ধকার একটু শুধু ফিকে হয়েছে। হয়ত তাই-ই। তা না হলে এখনো এ দেশে চোদ্দ পেরোতেই শতকরা চোদ্দ জন কিশোরীর বিয়ে হয় কি করে। যেখানে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ধার্য হয়েছে ১৮ বছর, সেখানে এ জিনিস নিশ্চয় বিসদৃশ। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বাল্যবিবাহের সেই ট্রাডিশন কিন্তু এখনো বহাল তবিয়তে। ভারতের প্রত্যন্ত প্রান্তে এখনো যে কিশোরী-মেধ যজ্ঞ চলছে শহরে বসে তা আঁচ করা যায় না। অথচ অপরিণত বয়সে মা হতে গেলে তার পরিণতি যে কত ভয়ংকর সে ব্যাপারে চেতাবনীর অন্ত নেই। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি। সেজন্যই এদেশে প্রসূতি মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর ক্রমবর্ধমান গতিও রোধ করা যায়নি। এসব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে এই নিবন্ধে। সংগে আছে দু'জন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার।





'কিশোরী ভজন/কিশোরী পূজন/কিশোরী চরণ সার।' এই কিশোরী ভজনার যুগ আমরা বহুকাল পেরিয়ে এসেছি। একালের কিশোরীরা আর জীবনের প্রত্যূষেই গিন্নিবান্নি সেজে শ্বশুরবাড়ি দৌড়য় না। তার বদলে তারা দল বেঁধে যায় স্কুলে, কলেজে, সিনেমা-থিয়েটারে, রেস্তোরাঁয়। অন্তত আপাত ছবি এটাই। এ ছবিটা দেখলে মাত্র দেড়শ' পৌনে দুশ' বছর আগের ছবির সংগে মেলানোই যায় না। মনে হয় যেন কত প্রাচীন, যেন সভ্যতার কোন ঊষালগ্নের ছবি। একবিংশ শতাব্দীর দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীকে বড় অচেনা মনে হয়। কিন্তু অতটাই কি অচেনা, যতটা আমাদের চর্ম চক্ষুতে ধরা পরে। নাকি 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে'। হয়ত তাই। উনিশ শতকের সেই শাস্ত্রের ঘেরাটোপ পেরিয়ে কিশোরী-ভজনা এখনো আছে, হয়ত একটু রেখে ঢেকে এই যা। তাই যদি না হবে তবে একবিংশ শতাব্দীর দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে কেন এখনো দূরদর্শনকে রোজ কিশোরী বিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যেতে হচ্ছে। ১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইন চালু হওয়ার পর ৩৭ বছর কেটে গেছে, এখনো কেন তবে এ প্রচার। কারণ, একটাই উনিশ শতকের সেই কিশোরী-ভজনা আড়ালে আবডালে এখনো বহাল তবিয়তে। যার ফলশ্রুতি দেশের প্রসূতি মৃত্যু-হারের দিকে তাকালেই আঁচ করা যায়। শুধু প্রসূতি মৃত্যুই নয় শিশু মৃত্যুর হারের দিক থেকেও ভারত অগ্রগণ্য। যার কারণ নিহিত আছে ওই বাল্যবিবাহের মধ্যেই। অথচ এমনটা তো হবার কথা ছিল না।

সেই ট্রাডিশন এখনো

একটা সময় ছিল যখন গৌরীদানের নিয়ম ছিল। এই প্রথাকে সমাজে পাকাপোক্তভাবে কায়েম করার জন্য তৎকালীন কুলীন সমাজ মনুসংহিতার দোহাই পারত। বলা হত – 'অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী, নববর্ষা তু রোহিনী/দশ বর্ষা ভবেদ্ কন্যা ঊর্দ্ধং রজঃস্বলা'। শুধু এটুকুর সাদামাটা বাংলা যা হয় তা মারাত্মক কিছু নয়। সরল বাংলায় ওই শ্লোকের অর্থ হল : আট বছরের কন্যাকে গৌরী বলে, নয় বছরের কন্যাকে রোহিনী, আর দশবছরের কন্যাকে – কন্যা। তারপরে অর্থাৎ দশ বছরের ওপরে যারা তাদের বলে – রজঃস্বলা। কিন্তু শুধু এই নিরীহ শ্লোক দিয়ে তো আর কিশোরী বিবাহের রমরমা বাজার বসানো যায় না। তাই বাবু সমাজ তার সংগে যা জুড়লেন তার মোদ্দা কথাটা হল – বারো বছর হয়ে গেলেও যিনি কন্যা দান করেন না তার পিতা, পিতামহরা মাসে মাসে সেই কন্যার ঋতুকালীন শোণিত পান করেন। কন্যাকে রজঃস্বলা দেখলে মা, বাবা, বড় ভাই নরকে যান। ব্যস, আর যায় কোথায়, ধর্মভীরু হিন্দুসমাজ মেয়ে কোল থেকে নামতে না নামতেই তোড়জোড় শুরু করে দিল তার বিয়ের। অবোধ শিশু জানল না শৈশবের রঙিন দিনগুলি কেমন। যৌবনে 'নীল আকাশের নেশায় মাতা ঘর ভোলা' হতে পারল না। রঙিন চেলি পড়ে বসে গেল বিয়ের আসরে। তার পরের জীবন আরো ভয়াবহ। সে যুগে জন্ম নিয়ন্ত্রণের রেওয়াজ ছিল না। তাই কিশোরী বয়স থেকে প্রৌঢ়ত্বের সীমা পর্যন্ত চলত ক্রমাগত সন্তানধারণের ধকল। সেদিনের সেই ছবিটা যে একেবারে মিলিয়ে গেছে তা কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীর চৌকাঠে দাঁড়িয়েও হলফ করে বলা যায় না।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে দিন বুঝি পাল্টেছে। কিন্তু আদপে তা নয়। মূল সামাজিক কাঠামো, সংস্কার সেই আগের চেহারাতেই আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য রদবদল হয়েছে মাত্র – অনেকটা পুরনো বাড়িতে চুনকাম করার মত। অনেক করেও বাল্যবিবাহ এবং পূর্ণ যৌবনে বিকশিত হওয়ার আগেই গর্ভসঞ্চারের সেই ট্রাডিশন নির্মূল করে ফেলা যায়নি। অথচ এর কুফল সম্পর্কে প্রচার আজ থেকে শুরু হয়নি। আর এতো সোজা কথা, গাছ লাগালেই যেমন ফল বা ফুলের আশা করা যায় না, তেমনি নারী হলেই তিনি গর্ভধারণের ক্ষমতা অর্জন করবেন তাও আশা করা যায় না। করলে তা প্রসূতি তো বটেই সন্তানের পক্ষেও ক্ষতিকর। ডাক্তাররা মনে করেন ১৮ বছর বয়সের আগে মেয়েদের দেহের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না। সাইকোলজিকাল তথা মানসিক বিকাশ এবং সাইকো-সেক্সুয়াল পরিপূর্ণতা আসে না। সেজন্যই ১৯৫৪ সালে বিশেষ বিবাহ আইনে বর-কনের ন্যূনতম বয়স ধার্য হয় যথাক্রমে ২১ ও ১৮। কিন্তু তা যে শুধু কাগজেকলমেই রয়ে গেছে তার হদিশ মিলবে ১৯৭১ সালের আদমসুমারি থেকেই। ওই বছরের লোক গণনায় দেখা গেছে এদেশের ১০ থেকে ১৪ বছরের মেয়েদের শতকরা ১৩.৭৯ জনই বিবাহিত। আইন মানলে এত কম বয়সে কোন মেয়ের বিয়ে হতে পারে না।

অনেক ভেবেচিন্তেই এক সময় মেয়েদের বিয়ের বয়স ধার্য হয়েছিল ১৮ বছর। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মেয়েদের গর্ভে সন্তান এলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ এই বয়সটা হল একটি তরুণীর পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে একজন যুবতীতে রূপান্তরিত হওয়ার বয়স। এই সময় মেয়েদের গর্ভে সন্তান এলে একই সংগে মা এবং গর্ভস্থ সন্তানের শারীরিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। যেটা অসম্ভব এবং অবৈজ্ঞানিক প্রয়াসও বটে। এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে যে ধরনের পুষ্টির প্রয়োজন তার যোগান দেওয়া আমাদের দেশের খুব কম পরিবারের পক্ষেই সম্ভব। আর সম্ভব হলেও তা আত্মীকরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর নয়। এর ফলে প্রসূতির গর্ভস্রাব হয়। একলাম্পসিয়া বা খিঁচুনি ধরে। ফলে শিশুটির গর্ভেই মৃত্যু হয়। কিংবা প্রসবের পর প্রসূতির জন্ডিস কিংবা মারাত্মক ধরনের অ্যানিমিয়া হয়। ফলে তাকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। তাছাড়া, অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হলে কিংবা তারা গর্ভবতী হলে আরেকটা অসুবিধা হল তাদের যৌনাংগের অপরিপূর্ণতা। এই সব ক্ষেত্রে মেয়েদের জরায়ু ও মূত্রথলি পাশাপাশি চলে আসে। এসব ব্যাপারে সতর্কবাণী আজ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে

না। ১৮৯০ সালের শেষের দিকে পঞ্চান্নজন মহিলা চিকিৎসক ভাইসরয়ের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন – কিছুতেই যেন চোদ্দবছর পূর্ণ হওয়ার আগে মেয়েদের সহবাসে বাধা না করা হয়। দু'হাজার বিশিষ্ট ভারতীয় মহিলার স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন পত্র পাঠানো হয়েছিল মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছেও।

ফুলমণির উপাখ্যান

একজন নিষ্পাপ বালিকাবধূর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ওই ধরনের তৎপরতা তুংগে উঠেছিল। নয় বছরের ওই বালিকা ফুলমণির বিয়ে হয়েছিল হরিমোহন মাইতি নামে পঁয়ত্রিশ বছরের একজনের সংগে। প্রথম রাতেই পুরুষ সিংহ হরিমোহনের ভালবাসার অস্থিরতায় রক্তারক্তি কান্ড। তারপর দীর্ঘ ১৩ ঘন্টা চলল মৃত্যুর সংগে পাঞ্জা লড়ালড়ি। তারপর সব শেষ। কুঁড়িতেই ঝরে গেল ফুলমণি। এ ঘটনা নিয়ে থানা পুলিশও কম হয়নি। হাইকোর্টে দীর্ঘদিন মামলা চলেছে। কিন্তু কামার্ত নরপিশাচ হরিমোহনের কোন সাজা হয়নি। কারণ, সরকারি খাতায় ফুলমণির বয়স দেখানো হয়েছিল দশ। তখন যে আইন চালু ছিল তাতে দশবছরের মেয়ের সংগে সহবাস বৈধ ছিল। তাই ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল হরিমোহন।

ফুলমণি বিকৃত কামের শিকার হলেও সেদিন একটা তীব্র প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। যার ফলস্বরূপ সহবাসের বয়ঃসীমা বাড়িয়ে ১২ করা হয়। সেদিনও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ গেল গেল রব তুলেছিল। সে অবস্থার সামান্য পরিবর্তন দেখা গেল বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। ১৯০১ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বর-কনের বয়সের গড় ছিল যথাক্রমে ২০ ও ১৩। অল্প বয়সে সন্তান ধারণ করলে সন্তান রুগ্ন হবে, প্রসূতির মৃত্যু হতে পারে – এসব চেতাবনীতে সেদিন কেউ কান দেয়নি। যার ফলভোগ এখনো করতে হয় ভারতবালাদের। শুধু ভারতই নয় উন্নয়নশীল সব দেশেই এই একই চেহারা। প্রসূতি মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার এইসব দেশে এত বেশি যে তা রীতিমত ভীতিপ্রদ। অথচ এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় একটাই। সেটা হল ১৮ বছরের কমবয়সী মেয়েদের বিয়ে একেবারে নিষিদ্ধ করা। এ ব্যাপারে দেশে একটা আইন আছে বটে তবে তাকে আর তোয়াক্কা করছে কে?





মৃত্যুর খতিয়ান

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে প্রসূতি মৃত্যুর যে পরিসংখ্যানটি পাওয়া গেছে, তাতে দেখা গেছে ১৯৮২ সালে প্রসূতি মৃত্যুর হার ছিল ৫/৮ শতাংশ। পড়শী বাংলাদেশেও এই একই হার ছিল। অথচ ১৯৮৩ সালে থাইল্যান্ডে প্রসূতি মৃত্যুর যে হার পাওয়া গেছে তাতে ভিরমি খাবার জোগাড়। ১৯৮৩ সালে থাইল্যান্ডে প্রতি একশ' জন প্রসূতির মধ্যে ৪০ জনকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়েছে। এবার ১৯৮৩ সালে ভারতে প্রসূতি মৃত্যুর হার কেমন ছিল সেটা দেখা যাক। সমগ্র ভারতে প্রসূতি মৃত্যুর চেহারাটা কেমন ছিল তার পরিসংখ্যান এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। তবে কতগুলি বড় বড় শহরে প্রসূতি মৃত্যুর যে হার

বালিকাবধূ না প্রসূতি বলি!

পাওয়া গেছে তা থেকেই গোটা ভারতবর্ষের চিত্রটা অনুমান করা যায়। ১৯৮৩ সালে বোম্বাইতে ৩৮৭৫ জন প্রসূতির মধ্যে ১০ জন, মাদ্রাজে ৮২০ জনের মধ্যে ২৫ জন, ইন্দোরে ৭৪০৩ জনের মধ্যে ৬৩ জন, বেনারসে ১৬১০ জনের মধ্যে ২৮ জন, কলকাতার ইডেন হাসপাতালে ৮৩৪৮ জনের মধ্যে ৯৩ জন, বাঁকুড়ায়-৬৩০৬ জনের মধ্যে ৭৫ জন, পাটনায় ৮৮৭৩ জনের মধ্যে ৯৯ জন, ইম্ফলে ২৯০৩ জনের মধ্যে১০ জন, ডিব্রুগড়ে ৩৮২২ জনের মধ্যে ২০ জন, থানজাবুরে (তামিলনাড়ু) ৬৫৩১ জনের মধ্যে ৫১৪ জন প্রসূতি মারা যায়।

অপরিণত বয়সে গর্ভসঞ্চারের ফলে প্রসূতির যেমন মৃত্যু হতে পারে, তেমনি মৃত্যু হতে পারে সন্তানেরও। কারণ এসব ক্ষেত্রে সাধারণত অপরিণত শিশুর জন্ম হয়। দেখা দেয় শিশু ও প্রসূতি উভয়েরই মৃত্যুর আশংকা। অনেক ক্ষেত্রে পৃথিবীর আলো দেখার আগে মাতৃগর্ভেই শিশুর মৃত্যু হয়। অথবা জন্মের সাতদিনের মধ্যে শিশুর মৃত্যু হয়। উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের চিত্র অস্বাভাবিক নয়। ইউনিসেফ্ পাঁচ বছর বা তার কমবয়সী শিশু মৃত্যুর যে হার দেখিয়েছে তা রীতিমত ভীতিপ্রদ। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশে ৪৩৭৪টি শিশুর মধ্যে ১৯৬ জন পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা গেছে। ভারতে মারা গেছে, ২২৬০৬ জনের মধ্যে ১৫৮ জন। অথচ প্রসূতি ও শিশু মৃত্যু ঊর্ধ্বমুখীনতা কমার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। উনিশ শতকের সেই ছবির সংগে আজকের ছবির বাহ্যিক তফাত লক্ষ্য করা গেলেও প্রকৃতপক্ষে অবস্থার আসমান জমিন কোন তফাত এখনো হয়নি।

উনিশ শতকে বাল্যবিবাহবিরোধী যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাতে কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর দোড়গোড়ায় এসে পরিস্থিতির একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনই আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। সে যুগে বাল্যবিবাহ-বিরোধী যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার পীঠস্থান কিন্তু বাংলা নয়। আন্দোলনের অংকুরোদগম হয়েছিল মহারাষ্ট্রে। এবং তার প্রধান হোতা ছিলেন বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক বৈরামজী মালাবারী (১৮৫৩-১৯১২)। তার আগে বাংলায় বাল্যবিবাহ বিরোধী লেখালেখি বিস্তর হলেও তেমন কোন জোরদার আন্দোলন শুরু হয়নি। বাংলায় বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে সে আন্দোলন শুরু হয় আরো অনেক পরে। কিন্তু ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মৃত্যু পর্যন্ত কোন বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। তিনি জীবদ্দশায় শুধু সহবাসের বয়:সীমা ১০ থেকে ১২-তে উন্নীত হতে দেখেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রয়াত হয়েছেন তাও প্রায় একশ বছরের কাছাকাছি হতে চলল। এই একশ বছরে বিবাহের বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর হয়েছে ঠিকই কিন্তু পরিস্থিতি পূর্ববৎ-ই আছে। কারণ আইন থাকলেও আইন মানার দায় নেই।

আলোর নিচেই অন্ধকার

গত একশ বছরে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি যে কেবল 'বর্ণপরিচয়'র মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে তা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। এদেশে এখন যে বিবাহপদ্ধতি চালু আছে তাকে কোন মতেই আদর্শ বলা চলে না। বিয়ের ব্যাপারে এখনো বাবা মার কথাই শেষ কথা। ঘটকতন্ত্র এখনো বহাল তবিয়তে। এখন মুখ্য ঘটকের দায়িত্ব নিয়েছে খবরের কাগজগুলি। সেটা পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন থেকেও অনুমান করা যায়। এছাড়া, সাইনবোর্ড টাঙিয়ে জাঁকিয়ে বসে আছেন ঘটককুল। ব্যতিক্রমও আছে। আর সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, এই ব্যতিক্রমটাই আমাদের চোখে পড়ে



আর তা দেখেই আত্মতৃপ্তিতে ডগমগ হয়ে যাই আমরা। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রত্যন্তপ্রান্তে এখনো যে উনবিংশ শতকের সেই অন্ধকারেই আচ্ছন্ন তা শহরে বসে আঁচ করা সম্ভব নয়। এই আমলে অর্থাৎ যে শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি সেই বিংশ শতকে বিয়ের বয়স কেমন ছিল বা আছে একটু খতিয়ে দেখা যাক একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চলতি শতকে ছেলেমেয়ে উভয় তরফেই বিয়ের বয়স বেড়েছে। কিন্তু কতটা বেড়েছে, সেটাই আলোচ্য।

১৯০১ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বর কনের বয়সের গড় ছিল যথাক্রমে ২০ ও ১৩ বছর। অর্থাৎ গত শতাব্দীর শেষ দশক এবং চলতি শতকের প্রথম দশক এই দীর্ঘ ২০ বছরে বিয়ের বয়স বেড়েছিল মেয়েদের ক্ষেত্রে মাত্র ১ বছর। তারও দীর্ঘ ১৯ বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৯ সালে সারদা আইন বা বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনটি পাশ হয়। এতে বরের ন্যূনতম বয়স ধার্য হয় ১৮ বছর আর কনের ১৪ বছর। ১৯৪৯ সালে আইনটি সংশোধন করে কনের বয়স একবছর বাড়ানো হয়। অর্থাৎ মেয়ের বিয়ের বয়স ধার্য হয় ১৫ বছর অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ব্রাহ্মরা যে-আন্দোলন করেছিল কনের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১২ থেকে বাড়িয়ে ১৪ করার জন্য সেটা বাস্তবরূপ পায় তারও ৮০ বছর পরে। ১৯৫৪ সালে বিবাহ আইনের আরেক দফা সংশোধন হয়। বর ও কনের ন্যূনতম বয়ঃসীমা ধার্য হয়,যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর। কিন্তু এ আইন করেও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ সালের আদমসুমারিতে দেখা গেছে, এ দেশে দশ বছরের ওপর যত মেয়ে আছে তাদের শতকরা ৬৪.৯ জনেরই শুধু বিয়ে হয়নি। বিবাহিত শতকরা ২২ জন। ১৩ থেকে ১৪ বছরের মেয়েদের মধ্যে দেখা গেছে ১৩.৭৯ শতাংশই বিবাহিত। অর্থাৎ ১৪ বছরের মধ্যে শতকরা ১৪ জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে ২১ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে যাদের, তাদের হার ৫.৩১ শতাংশ। সুতরাং আইন আইনই রয়ে গেছে। তা পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার বালাই নেই। যার ফলশ্রুতি কুমারী বলি এখনো একশ বছর আগের সেই চেহারাতেই আছে। যে দেশে আইন ভাঙার কোন সাজা নেই, সেদেশে এটাই সম্ভব। আর কতকাল এ অবস্থা বহাল থাকবে, 'নারী কবে অর্ধেক আকাশ' হয়ে উঠতে পারবে – তার জবাব দেবে ভাবীকাল। □

'অপরিণত মাতৃত্ব মৃত্যু ডেকে আনে'

ডাঃ রত্না বিশ্বাস

যে কোন কিছুই হোক না, পরিপূর্ণতার জন্য নির্দিষ্ট সময় লাগে। যেমন, গাছ লাগানোর পরেই ফুলের আশা করলে তা পাওয়া যায় না। তার জন্য গাছের ফুল ফোটানোর ক্ষমতা অর্জন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তেমনি নারী হলেই যে তিনি সন্তানধারণে সক্ষম হয়ে উঠবেন তা নয়, তার জন্যও তাঁকে দৈহিক বিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে বাল্য বিবাহ প্রচলিত সেই বৈদিক যুগ থেকেই। ফলে বাল্যাবস্থাতে মা-ও হতে হয় মেয়েদের। অথচ তখন তাদের হেসে খেলে বেড়ানোর সময়। তখনও দেহে আসেনি পুরোপুরি যৌবন। যৌন সম্পর্কের স্বাদ আস্বাদনের পরিপূর্ণ পরিণতি আসেনি মানসিকতায়। এই ফল যেমন নারীর নিজের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে প্রচন্ড সমস্যার, তেমনি সদ্যোজাত শিশু এবং সমাজ জীবনেও প্রচন্ড প্রভাব ফেলে। তাই অল্পবয়সে বিয়ে, তথা মাতৃত্বের ফলে কি ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় তা দু'জন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। এখানে হুবহু তাঁদের মতামত তুলে দেওয়া হল। নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগের আর এম ও কাম ক্লিনিক্যাল টিউটর ডাঃ রত্না বিশ্বাস জানালেন : ১৮ বছর



বয়সের আগে মেয়েদের দেহের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না। সাইকোলজিকাল তথা মানসিক বিকাশ, সাইকো সেক্সস্যুয়াল পরিপূর্ণতা আসে না। ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মেয়েদের গর্ভে সন্তান এলে নানান ধরনের সমস্যা দেখা দেয় কারণ অল্পবয়সী মেয়েদের গর্ভে সন্তান এলে তখন একই সংগে মা এবং শিশু উভয়ের শারীরিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। স্বভাবতই দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণ পুষ্টির। কিন্তু গর্ভাবস্থায় মা'র পক্ষে উভয়ের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি আত্তীকরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না যার প্রত্যক্ষ ফল হল প্রসূতির অ্যানিমিয়া। এছাড়া দেখা দেয় কন্সিমিয়া অফ প্রেগনেন্সি। অর্থাৎ মাতৃগর্ভে সন্তান আসার সাত মাসের মধ্যেই দেখা যায় মা'র হাত পা ফুলে যাচ্ছে। ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মায়েরা তা গ্রাহ্য করেন না। তাঁরা ধরে নেন যে গর্ভাবস্থায় মায়েদের এই ধরনের সমস্যা হয়েই থাকে। অতএব একে গুরুত্ব দেওয়ার তেমন প্রয়োজন নেই।

আরো দেখা যায়, অল্পবয়সী মেয়েরা গর্ভে সন্তান ধারণের ফলে একল্যাম্পসিয়ার শিকার হন। অর্থাৎ তাঁদের শরীরে খিঁচুনি দেখা দেয়। মাঝে মধ্যে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে পড়েন আর মায়েদের শরীরে অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া ঘটে যাওয়ার ফলে, জরায়ুর মধ্যেই শিশুর মৃত্যু ঘটে যায়।

এছাড়াও অল্পবয়সে বিয়ের ফলে মেয়েদের গর্ভসঞ্চার অসম্ভব। কারণ, তখন তাদের যৌনাংগেরই বিকাশ ঘটে না। ফলে সন্তান জন্মানোর সময় দেখা দেয় নানা ধরনের সমস্যা। যার প্রত্যক্ষ



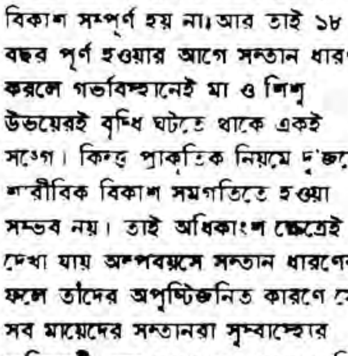
ফলে শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। এমনকি প্রসূতিরও মৃত্যু ঘটে।

আর ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়েদের গর্ভে সন্তান এলে প্রসবের সময় যেমন বিভিন্ন রকমের বাধার সৃষ্টি হয় তেমনি, এর ফলে অস্ত্রোপচারের সম্ভাবনাও যায় বেড়ে। আর এর ফলে ভেসিকো ভ্যাজাইনাল ফিস্‌চুলা (vesico vaginal fistula) রোগ দেখা দিতে পারে। এই বিশেষ ধরনের অসুখের ফলে মেয়েদের জরায়ু ও মূত্রথলি পাশাপাশি চলে আসে। এবং জরায়ু দিয়ে অনবরত মূত্র নির্গত হতে থাকে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে অপরিণত শরীরে বাচ্চা ধারণ। তাই অল্পবয়সে সন্তান ধারণ করলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধা হয় বেশি।

'মা হতে অন্তত অষ্টাদশী হতেই হবে'

ডাঃ জে মিত্র

এস এস কে এম হাসপাতালের অবসটিকাল অ্যান্ড গাইনোকলজি বিভাগের প্রফেসর ডিরেক্টর ডাঃ জে মিত্র বলেন, গাছের বৃদ্ধি দেখে আঁচ করা যায় তা থেকে কি ধরনের ফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমাদের ঠিক জানা নেই শিশুদেহের বিকাশ মা বাবার বয়সের ওপর কতখানি নির্ভরশীল। তবে এটা তো সার্বজনীন সত্য যে, শিশুরাই দেশ এবং জাতির ভবিষ্যৎ। তাই, শিশুর শুধু সামাজিক নয় দেহগত পূর্ণতা নিশ্চিত করার অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অল্পবয়সী অর্থাৎ ১৮ বছর বয়সের কম মেয়েদের ক্ষেত্রে দৈহিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। আর তাই ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে সন্তান ধারণ করলে গর্ভবিস্থানেই মা ও শিশু উভয়েরই বৃদ্ধি ঘটতে থাকে একই সঙ্গে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে দু'জনের শারীরিক বিকাশ সমগতিতে হওয়া সম্ভব নয়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অল্পবয়সে সন্তান ধারণের ফলে তাঁদের অপুষ্টিজনিত কারণে সেই সব মায়েদের সন্তানরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে না। ফলে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তো বটেই শিশুরা বয়সকালেও স্বাভাবিক শক্তি ও সুস্থতা অর্জন করতে পারে না। জীবনের উষালগ্নের অপুষ্টির ফল তাদের শুধু যৌবনেই নয় গোটা জীবনই বয়ে বেড়াতে হয়। শুধু শিশুকেই নয় মা-দেরও তার খেসারত দিতে হয়। অনেকে শিশুর মুখ দেখার আগেই ইহলীলা সাঙ্গ করে।



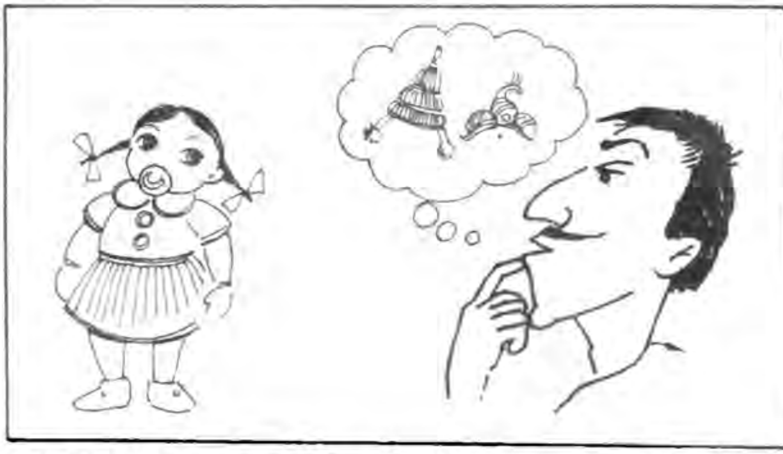
ফটো : তপন মুখার্জি

তাছাড়া অল্পবয়সী মায়েদের ক্ষেত্রে আরও অনেক ধরনের অসুবিধা হয়। যেমন পেলভিস'এর পরিপূর্ণ বিকাশ না হওয়ার ফলে প্রসবের সময় নানান ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে তাই অস্ত্রোপচার করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অপরিণত শিশুর জন্ম হয়। দেখা দেয় শিশু ও প্রসূতি উভয়েরই জীবনের আশংকা। মাতৃগর্ভেই শিশুর মৃত্যুহার এদের ক্ষেত্রে বেশি। অথবা শিশুর জন্মের সাত দিনের মধ্যেই শিশুর মৃত্যু ঘটে যায়। তাছাড়া অল্পবয়সী মায়েদের ক্ষেত্রে রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। তা ছাড়াও, স্বল্পবয়সী মায়েদের ক্ষেত্রে গর্ভপাত ঘটানোর প্রবণতাও থাকে বেশি। ফলে যেমন মা ও শিশুকে নানান সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তেমনি সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি হয়।

ডাঃ মিত্রের দেওয়া হিসাব : মৃত শিশু প্রসব বা প্রসবের সাত দিনের মধ্যে শিশুর মৃত্যুর হার আমাদের দেশে প্রতি হাজারে ৪০। আর মায়ের মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৮।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান যে, উন্নত দেশগুলিতে যেখানে এইসব ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার গণনা করা হয় প্রতি এক'শ হাজারে, সেখানে আমাদের মৃত্যু হার এখনও গণনা করতে হয় প্রতি হাজারের ভিত্তিতে। এ থেকেই অপরিণত মাতৃত্ব, শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর ছবিটা স্পষ্ট ধরা পড়ে।

সাক্ষাৎকার কাজী গোলাম গউস সিদ্দিকী



ব্যঙ্গচিত্র : গৌতম দাশগুপ্ত



অভিনয়কে ভালোবাসি প্রণয়ীর মতো

খেয়ালী দস্তিদার

১৮৮/৬ সোনেক্স (পি) লিমিটেডের ছিমছাম সাজানো গোছান কামরায় নিতান্ত অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে বসে-ছিলেন তেরো পার্বণ ও উড়নচণ্ডী এই দুই জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালের অভিনেত্রী খেয়ালী দস্তিদার ওরফে মুকু। ছিপছিপে চেহারা, পিঠ আর ঘাড়েরওপর লুটিয়ে পড়া চুলে চঞ্চল ছেলেমানুষ খেয়ালী হাসতে হাসতে বললেন 'আগে তো ক্যাডবেরি খাও, তারপর অন্য কথা —।'

ক্যাডবেরির টুকরো ভেঙে দেওয়ার সময় দেখলাম কতো সহজ, কতো আন্তরিক কতো ঘরোয়া তার চালচলন।

'টিভির দর্শকদের কাছে আমি হয় টিনা, নয় যূথী আর খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কাছে খেয়ালী দস্তিদার। কিন্তু বিশ্বাস করো আদতে টিনা, যূথী বা খেয়ালী দস্তিদার আদৌ নয় আমি স্রেফ মুকু।

'সেই সময়' সিরিয়ালে সুজিত ঘোষ এবং খেয়ালী দস্তিদার



২৯/১ পন্ডিতিয়া রোডের মুক্ শুনেছি জন্মের সময় আমি এত রুগ্ন এত অসুস্থ ছিলাম যে আমাকে নাকি কোচের বাক্সে তুলোর বিছানায় বহু যত্নে রাখা হত। জন্মেছি ১৯৬৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর। বাবা জোছন দস্তিদার, মা চন্দ্রা দস্তিদার আমার অতি আদরের ছোড়দা অমর মানে সৌমিত্র দস্তিদার ছোট মামা জগদীশ চক্রবর্তী, মামাতো দাদা বেণু মানে সব্যসাচী চক্রবর্তী এঁদেরই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কেটেছে আমার শৈশব বাড়িতে ছেলেবেলা থেকেই গন্ধ পেয়েছি বামপন্থী আব



জোছন দস্তিদার ও খেয়ালী

হাওয়ার কখনো তা উগ্র কখনো বা হাল্কা পারিবারিক নাটকের দল ছিল রূপান্তরি যা কিনা পরে হয় 'চার্বাক' তুমি নিশ্চয়ই জান বাবা জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' নাটকটি কীরকম আলোড়ন তুলেছিল। দুই মহলের সময় আমি খুব ছোট। তাই এ নাটকে অভিনয়ের সুযোগ পাইনি। কিন্তু বাড়িতে সবসময়ই অভিনয়ের একটা হাওয়া বইত, সকাল থেকে রাত, গভীর রাত পর্যন্ত চলতো নানান নাটকের মহড়া, নাটক লেখা, নাটকপাঠ। ফলে অভিনয় ব্যাপারটা শৈশব থেকেই রক্তের মধ্যে ঢুকে যায়। অভিনয় যে আমি বিধিবদ্ধ তালিম নিয়ে শিখেছি তা নয়, বাবার দেখে, মায়ের দেখে তো বটেই, বিভিন্ন শক্তিশালী শিল্পীর অভিনয় হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে ছোট থেকে। তারপর একদিন হঠাৎই আবিষ্কার করলাম অভিনয়কে আমি প্রায় প্রণয়ীর মতোই ভালোবেসে ফেলেছি। হৃদয়ের আনন্দ বেদনা-দুঃখ ব্যথা নৈরাশ্যকে বাক্যে সংলাপে অভিব্যক্তিতে মানুষের হৃদয়ে স্থাপন করতে উন্মুখ হয়ে উঠছে আমার কিশোরী হৃদয়। নিজের সত্তা ও ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ গোপন করে ফেলে একটি পুঁথির একটি স্বতন্ত্র চরিত্রের হয়ে উঠে আমি চাইছি দর্শকদের মনে আনন্দের অভিঘাত আনতে।

পারিবারিক নাট্যগোষ্ঠী 'চার্বাকে' অভিনয়ের প্রথম সুযোগ পেলাম যখন তখন আমার বয়স মাত্র ৯ অভিনয় করেছি পদ্য গদ্য প্রবন্ধের 'অণু'-র ভূমিকায়, উত্তরপুরুষের 'চন্ডী'-র ভূমিকায় সীতার অগ্নিপরীক্ষায় আমি হয়েছিলাম সীতা। আর বছর দুই আগে চার্বাকের বিভিন্ন প্রোডাকশনের নির্বাচিত অংশ নিয়ে অ্যাকাডেমিতে হল নাট্যকোলাজ। তাতে 'দুই মহলে'র যে অংশটি ছিল আমি তাতে ছিলাম বাতোসী চরিত্রে। দূরদর্শনেও আমার প্রথম প্রবেশ নাট্য অভিনেত্রী হিসেবে। কাকচরিত্রে কাকের ভূমিকায় অভিনয় করলাম। 'অযান্ত্রিক' গোষ্ঠীর সঙ্গে মরিয়ান এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম মলিয়েরের তার্তুফ নাটকে

সোনেক্স আমাদের পারিবারিক কোম্পানি কপালজোরে আমাদের প্রোডাকশন 'তেরো পার্বণ' দারুণ জনপ্রিয় হয়। বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা হাসি অশ্রু আর কিছু মূল্যবোধই ছিল 'তেরো পার্বণে'র বিষয়বস্তু। আসলে আমার মনে হয় অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা আর ভেঙে যাওয়া ধ্বংসে পড়া মূল্যবোধের এই দুর্দিনে পুরোনো কিছু আদর্শকে আঁকড়ে ধরার কারণেই বোধহয় এত লোকপ্রিয় হয়েছিল তেরো পার্বণ। যদিও মূল্যবোধ আর আদর্শকে স্থান দিলেও আমরা যুক্তিহীন সংস্কার, সমাজের বহু আচরিত জড়ত্ব অন্ধত্ব আর অভ্যাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হতে চেষ্টা করেছিলাম। পেরেছি কি না জানি না তবে যে নিয়ম সর্বস্বতা আর প্রথা-আনুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আমাদের পরিবারের সহজাত, 'তেরো পার্বণে' বক্তব্যে ও অভিনয়ে যথাসাধ্য সৎ ও আন্তরিক থেকে আমি তাকেই দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম। 'উড়নচন্ডী' ও আমাদের ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দিয়েছে তবে দর্শকদের মধ্যে 'তেরো পার্বণে'র স্মৃতি যে এখনও খুব উজ্জ্বল তার প্রমাণ পাই আমার পরিচিতি আর জনপ্রিয়তার সূত্র এখনও 'টিনা' ইমেজ তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা আশ্চর্য দীপঙ্করের নীতা আমার অভিনীত সেরা চরিত্র। এতো মনোযোগ, এতো আন্তরিকতা আর এতো যত্ন বোধহয় টিনা বা যূথীতে নেই। সোনেক্সের আগামী টি ভি সিরিয়াল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়ে' আমার ভূমিকা হীরাবুলবুল উনিশ শতাব্দীর বাবু কলকাতার বাইজী চরিত্র এ চরিত্রের অভিনয়ে সৎ আর যত্নবান থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। বাকিটুকু বিচার করার দায়িত্ব দর্শকদের এছাড়া বড়ো পর্দায় ছবি করারও ইচ্ছে আছে যথেষ্ট নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের ছবি 'মণ্ডলা'য় জয় ব্যানার্জির বিপরীতে অভিনয় করেছি অভিনয় আমার নেশা ও পেশা দুইই। ভালো পরিচালকের ভালো ছবিতে অভিনয় করতে পারলে খুশি হব খুব।

আমার অন্যান্য দিকগুলোর কথা যদি জিজ্ঞেস করো তো বলি, দ্যাখো খুব লজ্জা করছে বলতে আমি কিন্তু বেশ

ভালোছাত্রী ছিলাম। গোখেল স্কুলে পড়েছি ছোট্ট থেকে। ফার্স্ট ডিভিশনে মাধ্যমিক পাশ করেছিলাম। হায়ার সেকেন্ডারিতেও নম্বর ছিল সেভেনটি টু পার্সেন্ট। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাশ করে এম এ-তে ভর্তি হলাম কিন্তু ওই যে খেয়ালী আমার নাম মানে খামখেয়ালীপনা। এখন আর ইউনিভার্সিটিমুখো হই না। আসলে এম এ পাশের দিকে মনও নেই মোহও নেই। অভিনয়কে ভালোবাসি তার চেয়ে অনেক বেশি। স্কলার হতে চাই না আমি, চাই অভিনেত্রী হতে, জীবনকে মানুষের মধ্যে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও আনন্দের উৎস হতে। জানো ? একটা ঘটনা মনে পড়ছে। তখন খুব ছোট ছিলাম আমি। একবার একটা রচনা লিখতে দেওয়া হোল স্কুলে 'তোমার জীবনের লক্ষ্য।' আমাদের বাড়িতে তো তখন নাট্যচর্চার প্রবল ঢেউ – আর আমি সেই ঢেউয়েই আছড়ে পড়া ছোট্ট একটা জলপাখি শয়নে স্বপনে জাগরণে অভিনয়ের ঘোরে আছি। তখন সেই নিতান্ত ছেলেমানুষ বয়সেও লিখে ছিলাম 'সার্থক অভিনেত্রী হওয়াই আমার জীবনের লক্ষ্য।'

কোনো একজন দিদিমণি শাস্তি দিয়েছিলেন আমায়, বোধহয় পাকামি মনে করেছিলেন আমার এই প্রত্যাশাকে। অথচ এখন মাঝেমাঝে স্কুলে যাই যখন সেই দিদিমণিরাই ঘিরে ধরেন। আমার অভিনয় নিয়ে কত্তো কী জিজ্ঞাসা তাঁদের। এখন আমি খেয়ালী দস্তিদার কিনা বড় দুঃখ হয় চারপাশে শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষদের সংস্কৃতিবোধের নমুনা দেখে। ছোট্ট গ্রুপ থিয়েটার চার্বাকের নাম



সব্যসাচী চক্রবর্তী খেয়ালী

জানতো না কেউ। মুষ্টিমেয় ক'জন নাট্যমোদীর কাছেই ছিল আমাদের আবেদনের মূল্য আর আজ টি ভি সিরিয়ালের দৌলতে ঘরে ঘরে আমার নাম। একেবারে চিত্রতারকা বনে গেছি

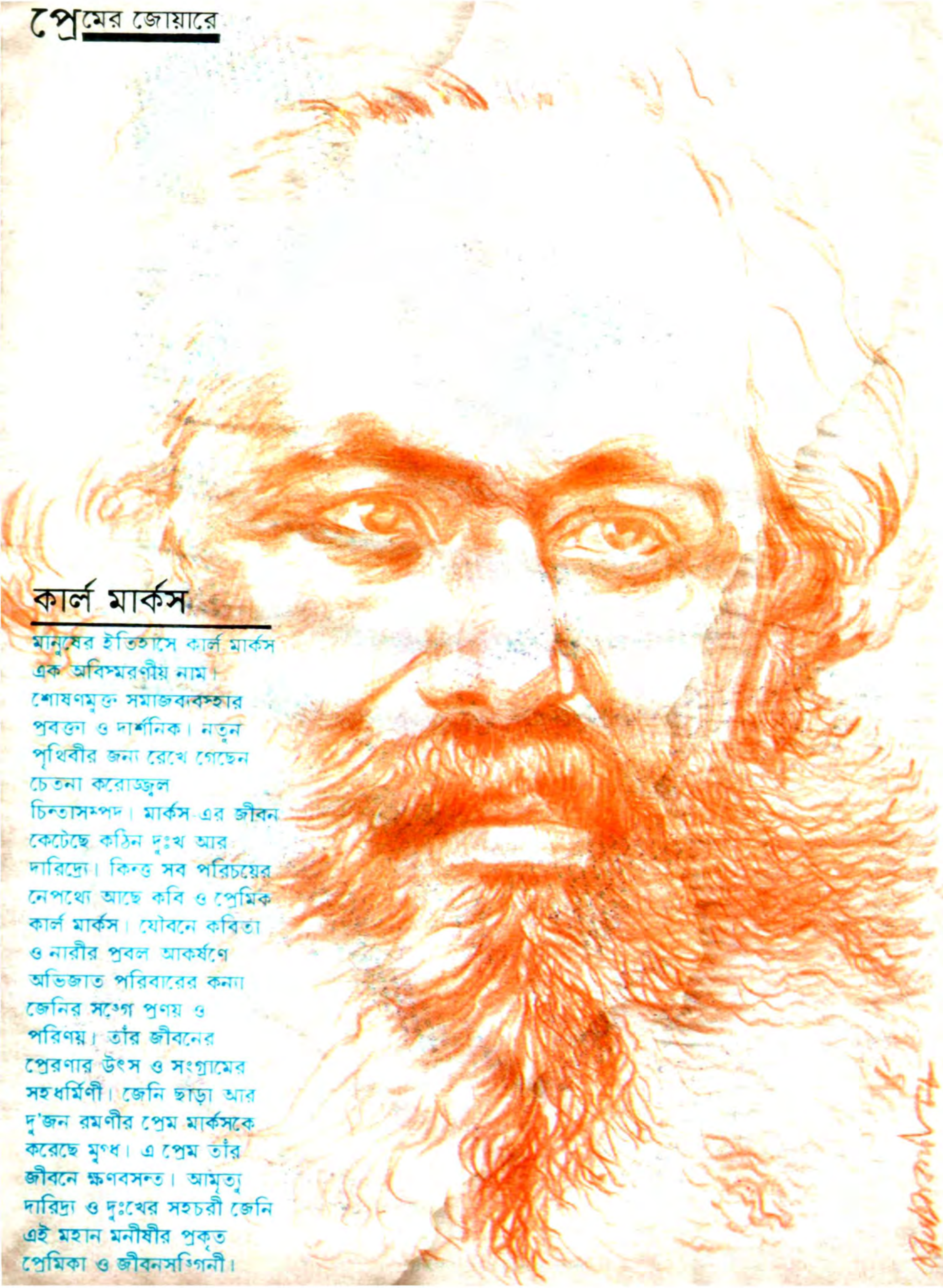
আমার ছবি আঁকার গুরুদেব পৃথিতযশ শিল্পী ইশা মহম্মদ গানও গাই। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির আঞ্চলিক ভাষার লোক-সংগীত, বাউল। শান্তি-নিকেতনে একবার ক্যাম্প হয়েছিল আমাদের। কয়েকটা মাত্র দিন সুরের মাদকতায় স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে দিয়ে কেটে গিয়েছিল। সে কথা মনে পড়লে আজও আচ্ছন্ন হয়ে যাই – রূঢ় বাস্তব ফেলে মন উধাও হয়ে যায় কোথায়। মনে হয় সেতার সরোদ এইসব বাজনার অলৌকিক সুরের সংগেও আমার যেন কোন আজন্মকালের রক্তের সম্বন্ধ রয়েছে, রয়েছে আবরণবিহীন সম্পূর্ণ মৌলিক এক সম্প্রীতি। আর তাই তো তন্ত্রীর সুরের ঝরনা আমার রক্তের মধ্যে ঢেউ তোলে আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষের জীবনের



খেয়ালী ও রঞ্জিত মল্লিক

এক একটি পরমতম নির্ভরতার কেন্দ্রস্থল থাকে যেখানে সে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে এক আশ্চর্য আনন্দ পায়। আমার মনে হয় আমার জীবনেরও আত্মসমর্পণের জায়গা ওই সুর, আর যেহাত থেকে সুরের অনাবিল স্রোত নির্গত হয় সেই মানুষ সেই হাত। আমি যেন তার সম্মোহনে আজীবন আমার যাবতীয় সম্বল নিঃশেষে উজাড় করার আয়োজনে অকৃপণ হয়ে বসে আছি। সেই যে কবির লাইন 'আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি যে জন পথে ভাসায়।' সুরের ধারায় ভেসে যেতে উন্মুখ হয়ে আছি আমি। আমায় নিতে আসুক সেই সুরজায়। কারণ আমি যে বিশ্বাস করি যে নিষ্ঠুর তার হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে

অনুলিখন বর্ণালী দাস



কার্ল মার্কস

মানুষের ইতিহাসে কার্ল মার্কস এক অবিস্মরণীয় নাম। শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার প্রবক্তা ও দার্শনিক। নতুন পৃথিবীর জন্য রেখে গেছেন চেতনা করোজ্জ্বল চিন্তাসম্পদ। মার্কস-এর জীবন কেটেছে কঠিন দুঃখ আর দারিদ্র্যে। কিন্তু সব পরিচয়ের নেপথ্যে আছে কবি ও প্রেমিক কার্ল মার্কস। যৌবনে কবিতা ও নারীর প্রবল আকর্ষণে অভিজাত পরিবারের কন্যা জেনির সঙ্গে প্রণয় ও পরিণয়। তাঁর জীবনের প্রেরণার উৎস ও সংগ্রামের সহধর্মিণী। জেনি ছাড়া আর দু'জন রমণীর প্রেম মার্কসকে করেছে মুগ্ধ। এ প্রেম তাঁর জীবনে ক্ষণবসন্ত। আমৃত্যু দারিদ্র্য ও দুঃখের সহচরী জেনি এই মহান মনীষীর প্রকৃত প্রেমিকা ও জীবনসঙ্গিনী।

১৯৫১ সাল। ইংল্যান্ডে রানী ভিক্টোরিয়ার আমল। এই বছরই লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিখ্যাত 'গ্রেট একজিবিশন'। সারা দেশে তুমুল হৈ চৈ। কিন্তু একজন এ নিয়ে মাথাও ঘামান না। বৃটিশ মিউজিয়ামের রিডিং রুমে বসে থাকেন বইয়ের স্তূপের মধ্যে। লিখে চলেন ঘন্টার পর ঘন্টা। দিনের পর দিন।

হঠাৎ চোখে পড়ার মত তাঁর চেহারা। চওড়া মুখ। ঘন ভুরু। মাথার চুল এলোমেলো। কালো অগোছাল দাড়ি। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

দিনের শেষে খাতাপত্র গুছিয়ে ফিরে যান ২৮ নম্বর ডিন স্ট্রিটে। দুটি ঘর। দোতলায়। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতে আসতে একেবারে অন্য মানুষ। স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসে হাসিমুখে। তিনি কাজের কথা ভুলে যান। কোলে তুলে নেন কনিষ্ঠ সন্তানটিকে।

অবশ্য মাঝে মাঝেই এ সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। অর্থের টানাটানিতে সংসার তখন চলতেই চায় না। পাওনাদারদের তাগাদায় লুকিয়ে থাকতে হয় ঘরের মধ্যে। কখনও কখনও বিক্রি করে আসতে হয় খাবার থালা বা অন্য কিছু।

তবু আনন্দের সন্ধেও ত আসে! ছেলেমেয়েদের সংগে তখন গল্পগুজব। কিংবা আপনমনে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া। নয়ত সারাদিনের লেখা কাগজ গুছিয়ে ফেলা। অথবা পরিবারের সেবিকার সংগে বসে দাবা খেলা। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যায়।

ইনিই কার্ল মার্কস। এ যুগের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাম্যবাদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তিনির্ভর।

আজকের জার্মানি নয়। একশ সত্তর বছর আগের জার্মানি। প্রুশিয়ার ছোট্ট শহর ত্রেভেস। সেখানে এক শিক্ষিত উদার ইহুদি পরিবারের বাস। ১৮১৮ সালের ৫মে এই পরিবারে জন্ম কার্ল মার্কসের। বাবা গরিব র‍্যাবি পরিবারের লোক। পেশায় আইনজীবী। সবে কিছুটা সমৃদ্ধির মুখ দেখেছেন। কিন্তু টাকা জমানোর বিদ্যা একেবারেই শেখেননি।

য়ুরোপের মাটিতে তখন ঢুকে পড়েছে যন্ত্রসভ্যতার বিপ্লবী বীজ। হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে রুশো ভল্টেয়ারের বাণী। জমিদারের আভিজাত্যকে দূরে ঠেলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে যন্ত্র সভ্যতার সুর।



জেনি মার্কস

সে সুর এসে পৌঁছল কার্লের বাবার মনেও। ইহুদি ধর্মের গোঁড়ামি ছেড়ে দিয়ে গ্রহণ করলেন খৃস্টধর্ম। সে যুগের খাঁটি মধ্যবিত্ত জার্মান তিনি। স্বদেশের প্রতি অনুরাগও প্রবল।

বাবার আধুনিক চিন্তাধারা কার্লকে প্রভাবিত করল। দুঃখের অতীতকে মনে রাখা নয়, বর্তমানের ভিত্তিতে সুন্দর ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা।

কার্ল তখন স্কুলের ছাত্র। বাবার মত আর একজন সংস্কৃতিবান মানুষের সান্নিধ্যে এলেন। ব্যারন ফন ওয়েস্ট ফালেন। বন্ধুর মত ব্যবহার তাঁর। অল্পবয়সীদের সংগে আলাপ করতে ভালবাসেন। ভালবাসেন শেক্সপিয়ার আর হোমারের লেখা পড়তে। কবিতার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। সে অনুরাগ সঞ্চারিত হল কার্লের মনের মধ্যেও।

পড়াশুনোয় বরাবরই ভাল কার্ল। গ্রামার স্কুল থেকে ভালভাবে পাশ করলেন। তাঁকে পাঠান হল 'বন' বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাবার ইচ্ছে, ছেলে আইন পড়ুক। কিন্তু আইন-শাস্ত্রের সংকীর্ণ গণ্ডি তাঁকে বেঁধে রাখতে পারল না।

তবু একটা বছর কেটে গেল ছাত্রজীবনের আনন্দ-কোলাহলে। কার্লের মনে তখন তারুণ্যের জোয়ার। বইয়ের রাজ্য তখনও পুরোপুরি গ্রাস করতে পারেনি তাঁর মনকে।

বন্ধুদের সংগে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ মনের মধ্যে ভেসে ওঠে একটি মুখ। ছেলেবেলার সঙ্গিনী। জেনি। ব্যারন ফন ওয়েস্ট ফালেনের মেয়ে। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসে জেনিকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন মার্কস। ভাসাভাসা সুন্দর দুটি নীল চোখ। বাদামী চুলের গোছা নেমে এসেছে মুখের ওপর। কথা বলেন মার্জিত ভঙ্গিমায়।

বয়েসে মার্কসের থেকে চার বছরের বড় জেনি। তবু মার্কস হৃদয় না হারিয়ে পারেন না। রূপে-গুণে জেনি তাঁর কল্পনার মানবী।

শহরের নামজাদা বাড়ির বিরাট গেট। সেই গেট পার হয়ে বাগানের রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকেন মার্কস। চোখ তার কি যেন খুঁজছে। মনে জমে আছে কত কথা। 'জানো জেনি, 'বনে' গিয়েও তোমার কথা ভুলতে পারিনি, ভুলতে পারিনি তোমার মিষ্টি গলার স্বর।' এই ভাবেই কি বলবেন জেনিকে ভাবতে থাকেন মার্কস।

বারান্দার ওদিক থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলেন জেনি। তিনি কি তাঁরই অপেক্ষায় ছিলেন? শুনতে পেয়েছেন কি পায়ের শব্দ

দৌড়ে মার্কসের সামনে এসে দাঁড়ালেন জেনি। মুখে মিষ্টি হাসি। বললেন, কবে এসেছ কার্ল?'

'আজই।'

'কেমন আছ?'

'ভাল না। পড়াশুনোয় একেবারেই মন বসছে না।'

'সে কি! কেন?'

'সত্যি বলব তোমাকে একদম ভুলতে পারছি না।'

জেনি মাথা নিচু করেন। মার্কস বলে চলেন, 'জানো, আমি এখন শুধু কবিতা পড়ছি। শেক্সপিয়ারের সনেট। মনে হচ্ছে, আমিও ও-রকম কবিতা লিখতে পারব। পারব না জেনি?

'কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে।' মুখ তোলেন জেনি। তারপর মার্কসের দুটি হাত টেনে নেন নিজের হাতের মধ্যে। বলেন, 'আমিও তোমায় ছেড়ে থাকতে পারছি না, কার্ল।'

তবু ছাড়তে হয়। বন ছেড়ে এবার

বার্লিন শহরে। সেদিনের বার্লিন 'সংস্কৃতি আর সত্যের কেন্দ্র'। সত্যের সন্ধানে মার্কসের মন ব্যাকুল। সে-ইশারায় সহজেই সাড়া দিলেন তিনি। দর্শন, আইনশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, শিল্পতত্ত্ব –কিছুই বাদ গেল না তার পড়বার বিষয় থেকে। নিজের মনের অবস্থা সুন্দর করে আঁকলেন একটি কবিতায়:

'আমার মনে সাড়া তুলছে যারা,
তারা ত থাকতে চায় না নীরব,
সামনের দিকে ছুটে যেতে চায়
অশান্ত অবারিত ডানায় ভর করে।
স্বর্গের সুষমাকে আমি করে তুলব
জীবনের অংশ,
প্রবেশ করব বিজ্ঞানের অন্তরে,
শিল্পসংগীতের আনন্দকে
জড়িয়ে ধরব দু'হাতে।'

(ভাষান্তর : সঞ্জয় ভট্টাচার্য)

মনের এই অদ্ভুত সমৃদ্ধি নিয়ে মার্কস পরপর তিনটি কবিতার বই লিখে ফেললেন। তখন থেকেই জীবনকে সত্যি বুঝতে চেয়েছেন মার্কস। জীবনের বাইরের খোলসটা নয়, তার মূলকে সন্ধান করতে হবে।

জীবনের পথে এগিয়ে চলেছেন মার্কস। খাওয়া পরার জীবন নয়। আদর্শ বিপ্লবীর জীবন। মানুষকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে চাওয়া, মানুষের জীবনের সত্য কোথায় লুকিয়ে আছে তা খুঁজে বার করার ব্রত উদ্‌যাপন। দার্শনিক হেগেলের সাহায্যে সে আদর্শের পথে অনেকটা এগিয়েছেন তিনি। এখন সংসারের ছোট গণ্ডি তৈরি করে সুখে দিন কাটানো তাঁর সাজে না

তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাবরাজ্যে যে বিচরণ করে না সে কি পরিপূর্ণ মানুষ ? বোধহয় না।

সেদিন জেনিকে কাছে ডাকলেন মার্কস। কোন দ্বিধা নেই। সংকোচ নেই। সরাসরি প্রশ্ন : 'আমাদের মিলনের পথে আর কি বাধা আছে, জেনি ?'

'বাধা ?' জেনি একটু দ্বিধাগ্রস্ত, 'বাধা দুই পরিবারের। তবু যদি চাও, সে-বাধা আমরা কাটাতে পারব না

'নিশ্চয়ই পারব। তুমি আমার সংগে থেক, তাহলেই হবে।'

'থাকব।'

আসলে জেনি তাঁর প্রণয়ীর বাইরের রূপকে ভালবাসেননি, ভালবেসেছেন



দার্শনিক মার্কস

তাঁর অন্তরের উজ্জ্বল সত্তাকে।

১৮৪৩-এ বিয়ে হল। মার্কস আর জেনির।

র‍্যাবি পরিবারের একটি ছেলেকে বিয়ে করলেন রাজভক্ত অভিজাত জার্মান পরিবারের একটি মেয়ে। অনেক জার্মান যুবকই বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে জেনির কাছে। একে একে সবই প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। তাঁর মনেপ্রাণে একটি নামই গভীরভাবে মুদ্রিত — কার্ল মার্কস। তাঁর আদর্শগত মহত্তর জীবনের ছোঁওয়ায় জেনি রোমাঞ্চিত। ঐশ্বর্য বৈভব তাই অর্থহীন তাঁর কাছে।

এই গরিব বিপ্লবী ছেলেটিকে ভালবাসার জন্যে জেনিকে কম লাঞ্ছনা পেতে হয়নি। অভিজাত পরিবার তাঁদের। কত প্রভাব প্রতিপত্তি। তবু সব তুচ্ছ মনে করে জেনি চলে এলেন মার্কসের সংসারে। আজ তাঁর স্বপ্ন সার্থক। সার্থক মার্কসের স্বপ্নও। জেনি তাঁর জীবনে অনুপ্রেরণা। জেনিকে ভালবেসে আজ ধন্য তাঁর জীবন।

সেদিন রাতে জেনিকে কাছে টেনে মার্কস যেন আপন মনেই বলেন 'তুমি ভুল করলে না তো জেনি, আমার সংগে তোমার জীবন জড়িয়ে — আমার চাল নেই, চুলো নেই, গরিব —'

মাঝপথে তাঁকে থামিয়ে দেন জেনি, 'তুমিই তো বলো মানুষের দারিদ্র্যের জন্যে সে নিজে দায়ী নয়। দায়ী এই ঘুন ধরা নোংরা সমাজব্যবস্থা। তা হলে 'ঠিকই। তবে

'ও-সব চিন্তা কোরোনা তো ! আমার দায়িত্ব সংসারের। আর তোমার দায়িত্ব মানুষের চেতনা ফিরিয়ে আনার। মনে থাকবে ?'

জেনিকে আরও কাছে টানেন মার্কস। বলেন, 'মনে না থেকে উপায় আছে ? আমারই কথা আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ !'

দুজনেই হেসে ওঠেন। সে হাসি আন্তরিক। আছে প্রাণের স্পর্শ।

মার্কসের বন্ধু আর্নল্ড রুজ। মার্কসকে প্রতি মাসে পনের শ মার্ক দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। একটি কাগজ-সম্পাদনার জন্য।

মার্কস স্ত্রীকে নিয়ে এলেন প্যারিসে। রুজের পরিকল্পনা মত 'ফ্রাংকো-জার্মান ইয়ার বুক্‌স' সম্পাদনার ভার নিলেন। প্যারিসের জীবন মার্কসের মানসিক জীবনকে অনেকদিক দিয়েই সমৃদ্ধ করে তুলল। এই সময়ে তাঁর সব থেকে বড় লাভ — এংগেলসের বন্ধুত্ব। এংগেলস 'ইয়ার বুকস'-এর একজন লেখক। সেই সূত্রে আলাপ। পরিচয়। ঘনিষ্ঠতা। দুজনের চিন্তা একই। শুধু ভাষা অন্যরকম। মার্কস বলেন, 'সামাজিক জীব হয়ে উঠলেই মানুষ মানুষের মুক্তির সন্ধান দিতে পারবে।' এংগেলস বলেন, 'আলাদা ব্যক্তি হিসেবে মানুষকে না ভেবে যদি সমাজ-সচেতন জীব বলে ভাবা যায় তাহলেই তৈরি করা বিরোধগুলো ঘুচে যাবে।' একের পর এক প্রবন্ধ লিখে চললেন মার্কস। একসময় ফরাসী থেকে অন্যত্র চলে যাবার আদেশ জারি হল। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন এংগেলস। অর্থের সমস্যা মিটল।

সপরিবারে প্যারিস থেকে ব্রুসেল্‌সে চললেন মার্কস। তাঁর দীর্ঘ আয়ত চোখে বিপ্লবের স্বপ্ন। সে স্বপ্নে মুগ্ধ হয়ে ছায়ার মত স্বামীকে অনুসরণ করে চলেছেন জেনি। ত্রেভেসের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে হিসেবে খ্যাতি যাঁর, সবচেয়ে সমৃদ্ধ ঘরের সন্তান যিনি। এ ভালবাসার স্রোত হৃদয়ের তটরেখা ধরে চলে। দেহের বাইরে মনের গভীরে এর উৎস। তাই সেখানে কেবলই জোয়ারের টান। ভাটার হদিশ পাওয়া যায় না। ব্রুসেল্‌সে এসেও মার্কসের নিস্তার ছিল না। বেলজিয়াম সরকার তাঁকে দিয়ে কবুল করালেন, ওদেশের রাষ্ট্রনীতি নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে পারবেন না।

শুধু তাই নয়, প্রুশীয় সরকার মার্কসকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে বেলজিয়াম সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। বাধ্য হয়ে প্রুশিয়ার নাগরিকত্ব ত্যাগ করলেন মার্কস। সেদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মার্কসের আর নিজের বলতে কোনো দেশ ছিল না।
১৮৪৮ সালে গ্রেপ্তার করা হল মার্কসকে। সস্ত্রীক। এমনকি, একদিন জেনিকে বারবনিতাদের সংগে রাত কাটাতে হল। দারিদ্র্যের পীড়ন থেকেও কঠোর এই রাত্রির পরীক্ষায় জেনি অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। স্বামীর জন্যে যে কোনো কষ্ট স্বীকার করতেই তিনি প্রস্তুত।
মুক্তি পেলেন মার্কস। কিন্তু বিতাড়িত হলেন ব্রুসেল্‌স থেকে। মার্কস ভাবেন, কেন এমন হয় তিনি তো সাধারণ মানুষের মুক্তির কথাই ভাবছেন, তাহলে মাঝে মাঝে তাঁর মনে পড়ে যায়, বিয়ের পরের সুখী দিনগুলোর কথা।

বিয়ের পর তাঁদের মধুচন্দ্রিমার দিন কেটেছিল সুইটজারল্যান্ডে। খরচের টাকা যুগিয়েছিলেন জেনির মা। সেই টাকা তাঁরা রেখেছিলেন একটা টিনের বাক্সে। দুটো হাতল তার। হোটেলের ঘরে সেই বাক্সের ডালা খুলে রেখে ছিলেন মার্কস। জেনি বলে উঠেছিলেন, 'এ কি! বাক্সের ডালা খুলে রেখে বেরোচ্ছ যে! টাকা নিয়ে নেবে তো লোকে!'
মৃদু হেসে মার্কস বলেছিলেন, নেবার জন্যেই তো! তোমার আপত্তি আছে?'
ততদিনে মার্কসকে অনেকটাই চিনতে পেরেছেন জেনি। স্মিত হেসে বললেন, 'না। তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে।'
একসময় লন্ডনে এসে মার্কস আর এংগেল্‌স 'কম্যুনিস্ট লিগ' স্থাপন করলেন। কিন্তু সে-দলে ভাঙন দেখা দিল। মনের ওপর প্রচন্ড চাপ। সে চাপ শুধু বাইরের কারণে নয়, পারিবারিক কারণেও। নিদারুণ অর্থাভাব চলছে তখন সংসারে। জেনি চিঠিতে লিখছেন...... আমার একবছরের মেয়েটা মায়ের বুকের দুধ পায়নি। দুশ্চিন্তা আর অশান্তি সব শুষে নিয়েছে। সুস্থ থাকা কাকে বলে তা ও জানে না।...
মার্কস তার বন্ধুকে লিখছেন : 'প্রিয় ওয়েডমেয়ার, জার্মানিতে রুপোর বাসনপত্র যা বন্ধক পড়েছিল তা বিক্রি করে দিয়ো। যে কটা টাকা বাঁচবে, তাই পাঠিয়ো। তাড়াতাড়ি। শুধু আমার বড় মেয়ে জেনির চামচের বাক্সটা যেন বিক্রি না হয়।'
এই দুঃখের দিনে মার্কসের একমাত্র সান্ত্বনা তাঁর স্ত্রী। জেনি সবসময়ই মার্কসকে পারিবারিক তুচ্ছতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন। বন্ধুরা যখন দূরে সরে গেছে, গভীর মমতা আর সহানুভূতি দিয়ে তিনি স্বামীকে ভুলিয়ে রেখেছেন। এ-দুঃখেই আমার বুক ভেঙে যায় যে পারিবারিক যন্ত্রণায় আমার স্বামীকেও জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। অনেককেই তিনি সাহায্য করেছেন, কিন্তু তাঁকে সাহায্য করবার আজ কেউ নেই। তাঁর একটা কথা শোনবার জন্যে যারা ভিড় করত – তারা কেউ তাঁর কাগজটাকে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখল না।'
একজন প্রুশিয়ান গুপ্তচরের বর্ণনায় মার্কসের লন্ডন বাসের পরিচয় পাওয়া যায়... 'ঘরে একটাও ভাল আসবাব নেই, ভাঙা, ছেঁড়া ধুলোভরা যত জিনিস। পান্ডুলিপি, বই, খবরের কাগজের গাদা, ছেলেদের খেলনার পাশে জড় হয়ে আছে। তারই সংগে মার্কসের স্ত্রীর সেলাইয়ের যতকিছু সরঞ্জাম। কানাভাঙা কাপ, ময়লা চামচে, ছুরি, কাঁটা, ল্যাম্প, দোয়াত, পাইপ, তামাকের ছাই স্তূপ হয়ে আছে একটি টেবিলের ওপর। ঘরে ঢুকলেই কয়লা আর তামাকের ধোঁয়ায় চোখে জল আসবে। ঘরে ঢুকে বসতে যাওয়া এক সাংঘাতিক ব্যাপার। যে চেয়ারটা খালি সেটার তিনটে পা। যেটা আস্ত, সেটার ওপর ছেলে মেয়েরা ঘরকন্নার খেলা খেলছে। বসতে হলে ওটার ওপরই খানিকটা জায়গা করে বসতে হবে।'
জেনির কিন্তু এ সবের জন্যে কোনো অভিযোগ ছিল না মার্কসের প্রতি। এরই মধ্যে অতিথিদের সাদরে অভ্যর্থনা



জেনি মার্কস (১৯৪০)

জানাতেন তিনি। তাঁর গর্ব, মার্ক্সের মত মানুষের ভালাবাসা পেয়েছেন তিনি। তাই আর কোনো প্রত্যাশা নেই জীবনের কাছে।

এদিকে মার্ক্সের জীবনে দিন যত এগিয়েছে স্বীকৃতি মিলেছে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার। কিন্তু সুখ আসেনি নিজের অসুস্থ দেহের বিড়ম্বনা তো আছেই, তার ওপর জেনির মধ্যে দেখা গেল ক্যানসারের লক্ষণ। তবু হাসি মুখেই পরিবারের কর্তব্য পালন করেন জেনি। প্যারিসে যান মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে। এদিকে দিন ফুরিয়ে আসে। মার্কস তখন প্লুরিসিতে আক্রান্ত।

পাশাপাশি দুটো ঘরে দুজনে শুয়ে। একজন আরেকজনকে দেখতে পান না। জীবনে তাঁদের মিলনে কোনও খুঁত ছিল না। আজও মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েছেন এসে দুজনেই। কিন্তু তবু কেন এই ব্যবধান

ভাল হয়ে উঠলেন মার্কস। যেদিনই হাটবার ক্ষমতা হল, গিয়ে দাঁড়ালেন স্ত্রীর বিছানার পাশে। চোখে-মুখে দুজনেরই আশ্চর্য দীপ্তি। শুধু দৃষ্টিতে কত কথা বলা হয়ে যায়। যেন দুটি তরুণ-তরুণী এক সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করার আয়োজন করেছেন। বয়েস ভুলে গেছেন তাঁরা, ভুলে গেছেন এবার বিদায়ের পালা।

৩০ নভেম্বর ১৮৮১। একটি ইংরেজি কাগজে মার্কস দেখলেন তাঁর ভাবধারা প্রশংসা করে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে। ইংল্যান্ড থেকে এই প্রথম খ্যাতিলাভ তাঁর। মৃত্যুপথযাত্রিনী জেনিকে প্রবন্ধটি পড়ে শোনালেন মার্কস। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জেনির মুখ। যে মহৎ আদর্শের পেছনে তিনি তাঁর জীবনকে নীরবে নিবেদন করে গেছেন সে আদর্শের দিকে কি মুখ ফেরাল দেশবিদেশ মার্ক্সের দিকে তাকিয়ে দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল তাঁর।

দুদিন পর জেনি মারা গেলেন এই সান্ত্বনাটুকুই শেষ প্রাপ্য হিসেবে পেয়ে। হয়ত তাই ছিল তাঁর সব থেকে বড় পাওয়া।

মার্ক্সের জীবনে জেনির ভূমিকা ছিল বিরাট। দুজনের প্রেম উত্তরণ ঘটিয়েছে তাঁদের মনোজগতের। তবু জেনিই



হেলেন ডেমুথ

মার্ক্সের জীবনে একমাত্র নারী নন। ১৮৪৫ সালে হেলেন ডেমুথ আসেন তাঁদের সংসারে সেবিকা হিসেবে। জেনির মা তাঁকে পাঠান। হেলেন সুন্দরী। যথেষ্ট আকর্ষণীয়া। ডাকনাম 'লেনচেন'। হেলেন শক্ত হাতে সংসার পরিচালনা করেন। দাবাখেলায় মার্কসকে সহজেই হারিয়ে দেন। ১৮৫১ সালে তিনি একটি ছেলের জন্ম দেন। নাম হেনরিক ফ্রেডরিক। বলা হয়, মার্কসই এর পিতা। মার্কস তা স্বীকার করেন না। ছেলেটি পালিত পিতার কাছে বড় হয়। ১৮৮৩ সালে মার্ক্সের মৃত্যু পর্যন্ত হেলেন মার্কস পরিবারের কাজ করেন। তারপর কাজের জন্যে চলে যান এঙ্গেলসের কাছে। হেলেনের কাছে সেবাই জীবনের একমাত্র ব্রত।

এছাড়াও মার্ক্সের জীবনে দুটি ছোট অনুরাগের ঘটনা আছে। তেত্রিশ বছরের ফ্রাউ টেনজের প্রতি একসময় অনুরক্ত হয়ে পড়েন মার্কস। মেয়েটি ইতালীয়। রুচিশীলা সংস্কৃতিমনা। এক ধনী জমিদারের স্ত্রী। অবশ্য এ অনুরাগ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

অ্যান্টনেট ফিলিপস। মার্ক্সের সম্পর্কিত বোন। তাঁর থেকে উনিশ বছরের ছোট। ১৮৬৩ সালে ফোঁড়ার আক্রমণে প্রচণ্ড কষ্ট পান মার্কস। সেই সময়ে অ্যান্টনেট তাঁর সেবা করেন। মার্ক্সের মন দুর্বল হয়ে পড়ে। সেরে ওঠার সময় মার্কস লেখেন, যখন অ্যান্টনেট আমাকে আদর করে, তখন ওর কালো চোখের তারা জ্বলজ্বল করতে থাকে। আমি কোনো কথা খুঁজে পাই না।'

এ সম্পর্কও স্থায়ী হয়নি। আসলে মার্ক্সের মনে সত্যিকারের প্রেম জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন একজনই। জেনি। জেনির মৃত্যুর দিন থেকেই যেন মরতে শুরু করলেন মার্কস। তারপর যে দু'বছর বেঁচেছিলেন, তাকে আর বাঁচা বলা যায় না। মানসিক পঙ্গুতা ছাড়াও ফুসফুসের দুর্বলতা আর সারল না। জীবনের হিসেব নিকেশে তাঁর হাতে ছিল শুধু দুঃখ আর দারিদ্র্য। স্ত্রী আর সন্তানদের জীবনে তাই কেবল তুলে দিতে পেরেছেন শুধু আশা। তাঁর চিন্তার সম্পদ ভবিষ্যতের মানুষ ঠিক বুঝতে পারবে। তবে একথা ঠিক, প্রেমের অমূল্য আশীর্বাদ তিনি পেয়েছেন। এ তো কম সৌভাগ্য নয় তাঁর কাছে।

১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ। হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। পাশে তখন কেউ নেই।

স্ত্রীর কবরেই কবর দেওয়া হল মার্কসকে। কোনো অনুষ্ঠান হল না। বন্ধু এঙ্গেলস তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন : 'ডারউইন যেমন জৈবিক প্রকৃতির বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, মার্কস তেমনি মানুষের সমাজপ্রকৃতির বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। কথাটি অতি সাধারণ, কিন্তু তা আদর্শবাদের জঞ্জালে চাপা পড়েছিল। সে কথা হচ্ছে, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও ধর্মের দিকে মনোযোগ দেবার আগে মানুষকে খেতে-পরতে হয়, হয় বাসস্থান নির্মাণ করতে। রাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক কোনো রাষ্ট্রই মার্কসকে থাকবার ঠাঁই দেয়নি।... মাকড়সার জালের মত তিনি তা পাশে সরিয়ে উপেক্ষা করে গেছেন। তাঁর মৃত্যু গৌরবময় – সাইবেরিয়ার খনি থেকে শুরু করে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী শ্রমিক তাঁকে ভালবেসেছে –আজ তাঁর মৃত্যুতে অশ্রু বিসর্জন করছে।... বহু শতাব্দীর মধ্যে দিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন – বেঁচে থাকবে তাঁর সৃষ্টি।'

শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পরবর্তী সংখ্যায় : অ্যালবার্ট আইনস্টাইন)

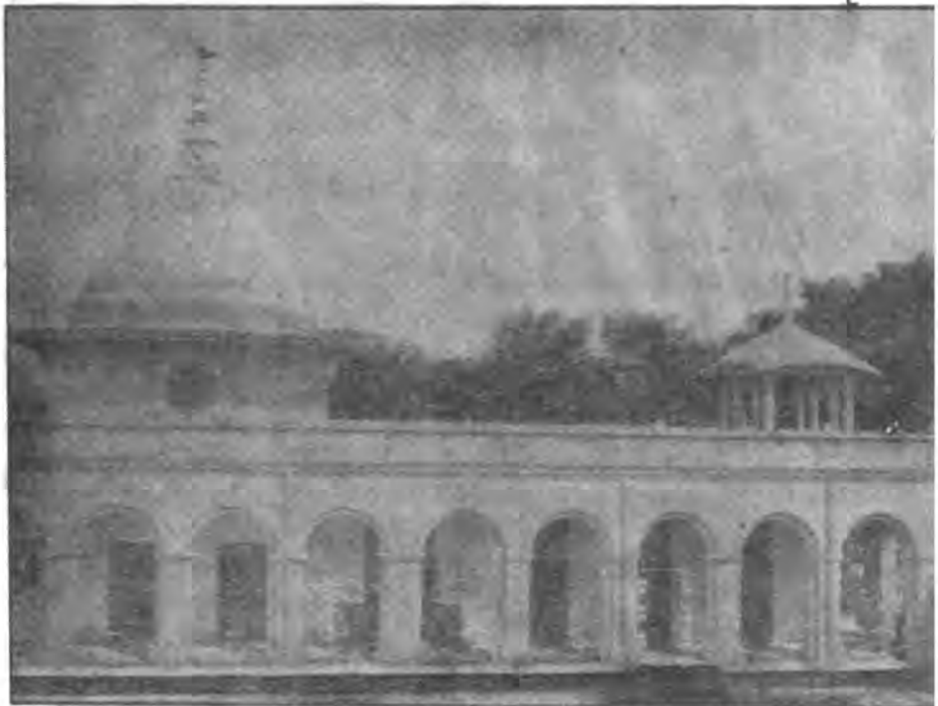
ভ্রমণ

ঘুরে আসুন জয়রামবাটী

পাহাড় থেকে সাগরে কিংবা ঝর্না থেকে অরণ্যে তো ফি বছরই যাওয়া হয়। এছাড়া কাছে-দূরে ছোট বড় বিখ্যাত জায়গাগুলো বাদ যায় না ভ্রমণকারীর তালিকা থেকে। এবার বরং আরো কাছে – এই ঘরের কাছেই চলুন ঘুরে আসা যাক। হাতে মাত্র একটা রবিবার থাকলেই চলবে। আর বাজেট তাও সামান্য। তাছাড়া দুটো কাজ একসংগে হবে, তীর্থ এবং ভ্রমণ।

চলুন বেড়িয়ে আসা যাক জয়রামবাটীতে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্ত্রী সারদামণি দেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটী। বাঁকুড়া জেলার এই ছোট্ট গ্রামটির মাটি রামকৃষ্ণের ভক্তদের কাছে 'চন্দন-সমান'। কলকাতা থেকে নানা ধরনের কনডাক্টেড ট্যুরের ব্যবস্থা হওয়ায় আজকাল প্রায় সারা বছরই পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। সারদা মায়ের জন্মদিন, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে এখানে মেলা বসে, উৎসব হয়। তখন ভিড় আরো বাড়ে।

কলকাতা থেকে জয়রামবাটী মাত্র ঘণ্টা চারেকের পথ, বাসেই যেতে পারেন। এসপ্লানেডের বাস গুমটিতে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত অসংখ্য বাস পাবেন। চাইলে সরকারি বাসেও যেতে পারেন কিংবা পেতে পারেন বেসরকারি বাস। সি এস টি সি এবং ডি এস টি সি-র বাঁকুড়া, দুর্গাপুর অথবা বিষ্ণুপুরগামী যে-কোনো বাসে উঠে বসলেই সাড়ে তিন ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবেন জয়রামবাটী। ভাড়া বার টাকা। আবার এমন বাসও পাবেন যেগুলো শেষ হচ্ছে জয়রামবাটীতে। তবে ভাল হয়, যদি আপনি সকালের দিকেই যান। বেলা বাড়লে রোদ বড্ড চড়া হয়ে ওঠে। অবশ্য শনিবার যদি আপনার গোটা ছুটি না থাকে তাহলে বিকেলের দিকে বাসে ওঠাই আপনার পক্ষে সুবিধেজনক হবে। আর হাতে থাকবে পুরো রবিবারটা। বাসে ভ্রমণ যাঁদের পোষায় না – বা ট্রেনের খোলা মেলা আর দুলকি চাল যাঁদের বেশি পছন্দ তাঁরা যেতে পারেন বিষ্ণুপুর হয়ে ঘুরে। বিষ্ণুপুর থেকে সাতাশ মাইল এগোলে জয়রামবাটী। বাসে যেতে হবে। তাছাড়া ট্রেনে তারকেশ্বর গিয়ে সেখান থেকেও বাস ধরতে পারেন। তবে এসপ্লানেডের বাসে উঠলে জানলার ধারটি বেছে নিতে ভুলবেন না। প্রকৃতির রূপ দেখতে দেখতে পৌঁছে যাবেন; সময়ের হিসেব থাকবে না। মাঝে দশ মিনিটের জন্য বাস থামবে আরামবাগে। প্রাতঃরাশটা



জয়রামবাটী মাতৃমন্দির

আমোদর নদী : গঙ্গা-জ্ঞানে এখানেই স্নান করতেন মা সারদা





তালপুকুর : শ্রীশ্রীমা আসতেন ভক্তদের সঙ্গে দেখা করতে স্নান করতে

সেখানেই সেরে নিন। নোনতা, মিষ্টি, মুড়ি, গরম তেলেভাজা সবই পেয়ে যাবেন পথের ধারেই।

রবিবারটা হাতে নিয়েছেন নাকি আজই ফিরবেন কলকাতায়। আজ ফিরতে হলে তাড়াতাড়ি হোটেলে গিয়ে খেয়ে নিন। আমিষ বা নিরামিষ যেরকমটি চাইবেন পাবেন। মাথা পিছু পাঁচ থেকে ছ টাকার মধ্যেই সেরে নিতে পারবেন দুপুরের খাওয়া। এবার দ্রষ্টব্য যা কিছু দেখে নিয়ে বিকেল পাঁচটার ফিরতি বাসে ফিরে আসুন কলকাতায়। আর যদি একটা দিন থাকতে চান তো জায়গার অভাব হবে না। কেবল দিন সাতেক আগে একটা পোস্ট কার্ড ছেড়ে দিন রামকৃষ্ণ সারদা মঠের গেস্ট হাউসের ঠিকানায়। ঠিকানা : স্বামী শিবরূপানন্দ মহারাজ, প্রযত্নে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠ ও মিশন, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া। বিছানাপত্তর সব আছে, খাওয়ার ব্যবস্থাও ওখানেই হবে। এছাড়া টুরিস্ট লজ আছে। বি বা দি বাগের অফিস থেকে বুক করে যেতে পারেন অথবা ওখানে গিয়েই করতে পারেন। শুধু থাকার জন্য মাথা পিছু পঁচিশ টাকা। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা নেই। খাওয়ার পাট বাইরের হোটেলে চুকিয়ে নিতে পারেন।

সবই তো হল, কিন্তু কোথায় যাবেন, কী দেখবেন সেসব তথ্য দরকার। সারদাদেবীর জন্মভিটে 'মাতৃমন্দির'টি সবার আগে দেখে আসুন। মাতৃমন্দিরের কয়েকটি বাড়ির পর বড় রাস্তার মোড়ে 'ভানুপিসির ভিটে'। এখানে রামকৃষ্ণদেব কয়েকবার এসেছিলেন। ওখান থেকে চলুন 'যাত্রা সিদ্ধিরায় ধর্মঠাকুরের মন্দির'। ঘোষপাড়ার পশ্চিমদিকে একটি আটচালার ছোট মন্দির। শোনা যায় সারদাদেবী কোথাও যাওয়ার আগে এই মন্দিরে প্রণাম করে যেতেন। আর আছে দীননাথ দত্তের পাঠশালা। গ্রামের দক্ষিণে বারোয়ারিতলায় শীতলা মন্দিরে গ্রামের দীননাথ দত্তের পাঠশালা ছিল। সারদাদেবীর ভাইয়েরা এখানে পড়তেন। সারদাদেবীও মাঝে মাঝে আসতেন এখানে। পাঠশালাটি নেই। কিন্তু মন্দিরটি আছে।

জয়রামবাটীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ আমোদর নদ এখনো দেখা হয়নি। বিকেলের দিকে ঘুরে আসুন নদীর পাড় ধরে। আমোদরের তীরে পঞ্চমুণ্ডির আসনটি দেখতে ভুলবেন না। আরো আছে সিংহবাহিনীর মন্দির। অতীতে মন্দিরটি ছিল চালাঘরে। এখন অবশ্য সুদৃশ্য পাকাবাড়ি।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি হয়েছে, এবার একটু জিরিয়ে নিন। 'মায়ের ঘাটে' গিয়ে বসুন। স্নিগ্ধ শীতল পুকুরের জলে নেমে হাতে মুখে জল দিন। ক্লান্তি কখন চলে গেছে জানতেই পারবেন না। □

অশোক সেন

পুণ্য পুকুর : এখনো আকর্ষিত



শিশুপালনে গ্রাম্য ছড়া-প্রবাদ-প্রবচন



সুনীতি মুখোপাধ্যায়

কে জানে, সেকালের মায়েরা শিশুপালনের মতো দায়িত্বপূর্ণ কর্মটি কীভাবে সম্পাদন করতেন, যেদিন শিশুর সার্বিক উন্নয়নের জন্যে না ছিল কোনো পদ্ধতি, না ছিল কোনো প্রণালী বা প্রকল্প!

আমি বলতে চাইছি সেই সব পুরনো দিনের কথা, যেদিন স্ত্রীশিক্ষা দূরে থাক, পুরুষদের আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওঠার মানসিকতা এবং ব্যবস্থা — দুই-ই ছিল অনুপস্থিত।

প্রশ্ন জাগে, সেদিনের শিশুরা কি তাহলে সেইভাবে বড় হত, যেভাবে আগাছারা আপন তাগিদে জল-হাওয়া আলো কুড়িয়ে নিয়ে বড় হতে সচেষ্ট হয়? উত্তরে না বলার জোরদার দৃষ্টান্ত আছে। আর সেই দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য বহন করে অধুনা প্রায়-বিস্মৃত কতকগুলি ছড়া-প্রবাদ-প্রবচন, যেগুলি আজকের দিনের মায়েদের মুখে কথায় কথায় উচ্চারিত না হলেও এগুলি একদা গ্রাম বাংলার মায়েদের মুখে শোনা যেত। আর সেইসব ছড়া-প্রবচনগুলির মধ্যেই বোধহয় তাঁরা খুঁজে পেতেন শিশুপালনের নির্দেশনা।

বাংলার মাটিতে দূর্বো ঘাসের মতো সেকালের অশিক্ষিত (কেতাবি বিদ্যার আলোয়) মায়েদের মনের উর্বর জমিতে গজিয়ে উঠত ছড়া-প্রবাদ-প্রবচনগুলি যেন এক স্বাভাবিক ধর্মে। তাই এই ধরনের ছড়াগুলির আর এক পরিচয়, মেয়েলি ছড়া। ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলির পাশাপাশি এই ছড়াগুলির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ সেকালের মানুষদের বক্তব্যকে অবশ্যই জোরালো করে তুলত। ছড়াগুলির মধ্যে মেয়েলি গন্ধ থাকা সত্ত্বেও পুরুষশাসিত সেদিনের সমাজে পুরুষেরাও যথাযথ পরিস্থিতিতে এগুলি ব্যবহারে কুণ্ঠাবোধ করত না বোধহয়। যাই হোক, গ্রাম্য ছড়া-প্রবাদ-প্রবচনগুলি কেবল শিশুপালন কেন, আমাদের জীবনচর্যার বিভিন্ন দিকেই আলোকপাতে সমর্থ।

বর্তমান নিবন্ধে আমি শিশুপালন সম্পর্কে গুটি কয়েক গ্রাম্য ছড়া প্রবাদ প্রবচনের উপস্থাপনা ঘটাব, সেগুলি প্রমাণ করবে, সেকালের কেতাবি বিদ্যায় অশিক্ষিতা মায়েরা-মেয়েরা শিশুপালন সম্পর্কে কত সহজ-সরলভাবে মূল্যবান পরামর্শ রেখে গেছেন। সেগুলি আজও কোন রকমে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে প্রাচীনাদের মধ্যে, যাঁরা তাঁদের স্মৃতির ঝাঁপি থেকে কিছু ছড়া-প্রবাদ প্রবচন উপহার দিতে পারেন। সংগ্রহ করতে পারলে সেগুলি একই সংগে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগার সংগে সংগে বাংলার লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারকেও সমৃদ্ধ করে তুলত।

অনেক বাপ-মা মনে করেন, শিশুর বয়েস নিদেন পক্ষে তিন-চার বছর না হওয়া পর্যন্ত তাদের কোনো কিছু শেখানোর প্রশ্নই ওঠে না। অনেকে অমূলক যুক্তি দেখিয়ে বলতে চেষ্টা করেন, ওই বয়েসের আগে শিশুদের কিছু নির্দেশ দেওয়া অর্থহীন, কারণ তখন তারা তা গ্রহণের প্রয়োজনীয় মানসিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যুক্তিটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শিশুর শিক্ষা শুরু হবে তার একান্ত শৈশব থেকেই। কারণ তিন বা চার বছর বয়সে পদার্পণের পূর্বেই শিশুর সামনে তার যথেচ্ছ আচরণের বিপক্ষে নির্দেশ না থাকলে সে ওই সময়ের মধ্যেই কতকগুলি বিরক্তিকর অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। যেগুলি পরবর্তী সময়ে শুধরে দিতে অভিভাবকদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে গ্রাম্য ছড়া বলে

'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ,
পাকায় করে টাঁস্ টাঁস্।'

শিশুর ভবিষ্যৎ শুধু তার পিতা-মাতার ওপর নির্ভর করছে, এ কথা বললে ভুল বলা হবে। কারণ যুক্তিটি একতরফা। শিশুর ওপরেও নির্ভর করছে পিতা-মাতার ভবিষ্যৎ। আবার পারিবারিক এবং সামাজিক গন্ডি পার হয়ে আমাদের দৃষ্টির বিস্তার ঘটালে আমরা দেখি, শিশু সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ। কিন্তু আমাদের সব আশাই বরবাদ হয়ে যাবে শিশুর যথাযথ পালনে গলতি-গাফিলতি থাকলে। আজকের সমাজে কন্যারা নানা বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিলেও আজও আমরা 'রত্ন' বিশেষণে বিভূষিত করি পুত্রদের কন্যাদের নয়। কিন্তু পুত্রসন্তানের সামনেও অভিভাবক হিসাবে ফলপ্রসূ পথ নির্দেশ না রাখতে পারলে সে বা তারাও যন্ত্রণারই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অভিভাবকদের সচেতন করতে সেই কথাই মনে করিয়ে দেয় গ্রাম্য ছড়া

'অভাগিনীর দুটো পুত,
একটা দানো, একটা ভূত।'

আবার শিশুকে ভবিষ্যতে আদর্শবান হিসাবে দেখার বাসনা পোষণ করতে হলে বাপ-মাকেও তার সামনে আদর্শের দৃষ্টান্ত পোষণ করতে হবে। ছেলেমেয়েদের সামনে বাপ-মা যদি অনুকরণ বা অনুসরণযোগ্য কিছু করতে না পারেন, তাহলে ভবিষ্যতে তাঁরা

তাদের কাছ থেকে বড় মাপের কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা করবেন কেমন করে আর সেই যুক্তিরই প্রতিধ্বনি নিচের প্রবাদটিতে –

'আমড়া গাছে আম হয় না।'

আবার এমন অভিভাবক-অভিভাবিকারও অভাব নেই, যাঁরা অবস্থা-বিপর্যয়ে অভিপ্রেত শিক্ষালাভ করতে পারেননি। তাঁরা তাঁদের সন্তানপালন সম্পর্কে হতাশায় ভোগেন। তাঁরা ভাবেন, তাঁদের সন্তানদেরও হয়তো অভিপ্রেত শিক্ষালাভের সুযোগ হবে না। কিন্তু তাঁদের এই হতাশা অহেতুক। কারণ সন্তানপালনে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা থাকলে তাঁরা অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সন্তানরা উল্লেখ্য শিক্ষা অর্জন করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আবার সন্তানপালনে সচেতনতার অভাবে শিক্ষিত বাপ-মার সন্তানও মহামূর্খ হতে পারে। তাই একই সঙ্গে অশিক্ষিত-অর্ধ-শিক্ষিত অভিভাবকদের হতাশা দূর করতে এবং শিক্ষিত অভিভাবকদের সাবধান করে দিতে গ্রাম্য ছড়া বলে

'কাকের ডিমও সাদা হয়,
বিদ্বানের পুতও গাধা হয়।'

শিশুদের কালে মানুষের মতো মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে হলে অভিভাবকদের স্নেহান্ধ হলে যে চলে না, আমাদের পুরাণ এবং ইতিহাস সে বিষয়ে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। সন্তানের প্রতি স্নেহ থাকবে বইকি। তবে তার মাত্রাধিক্য ঘটলে ছেলেমেয়েদের পরকাল ঝরঝরে হতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। বয়স্কদের মধ্যে যেমন সময় সময় প্রতিবেশীদের সঙ্গে নানা কারণে বিবাদ বাধে, বাচ্চাদের মধ্যেও তেমনি সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে টুকরো-খুচরো বিবাদ বাধা স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, ছোটদের ছোট বিবাদে বড়রাও অযথা নাক গলান এবং উভয় পক্ষই তখন নিজের ছেলেটি কিংবা মেয়েটির দোষ-ত্রুটি না ধরে অপরের ছেলে অথবা মেয়ের কাঁধে দোষের বোঝাটি চাপিয়ে দিতে যত্নবান হন। এতে আপাতদৃষ্টিতে এক পক্ষের জয় হলেও এর পরিণাম ভাল হয় না। সন্তানকে নিখুঁতভাবে গড়ে তুলতে হলে নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সেগুলি শুধরে দেওয়া উচিত। তার ফলে অভিভাবক সাময়িক পরাজয়ের হতাশায় ভুগলেও ফলটি নিঃসন্দেহে শুভ হয়। আর সেই শিক্ষাটি অতি সহজভাবে দিতে গ্রাম্য ছড়ার উপস্থিতি –

'পরের পুত দামাল,
না, আপন ঘর সামাল।'

শিশুর ক্ষেত্রে তার সামাজিক পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ততটা ক্রিয়াশীল নয়, যত বেশি ক্রিয়াশীল তার পারিবারিক পরিবেশ। কারণ শিশুর বিচরণের গন্ডি তার পরিবেশের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তখন তার মনে গভীর ভাবে ছাপ ফেলে তার আপনজনদের আচার-আচরণ ইত্যাদি। যেগুলি তখন তার কাছে অনুকরণ এবং অনুসরণের বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়। তাই তাদের কাছে এই সময়ে পিতা-মাতাকে সব থেকে বেশি সচেতন হতে হবে তাঁদের কথাবার্তা এবং আচার-আচরণ বিষয়ে। কারণ তখন বিচার অনুযায়ী গ্রহণ বর্জনের ক্ষমতা শিশু অর্জন করে না। দেখা গেছে, শিশুপুত্র তার পিতাকে এবং শিশুকন্যা তার মাতাকে অনুকরণের চেষ্টা করে। এবং এই কথাটি মনে রেখেই বর্তমান ছড়াটির প্রচলন

'বাপ গুণে বেটা,
মা গুণে ঝি।'

শিশুপালন প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত আপ্তবাক্যটি অবশ্যই মনে রাখার মতো –

'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেৎ।'

অর্থাৎ শিশুকে তার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত লালন-পালন করো, তাড়না করো তার দশ বছর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু সে ষোল বছর বয়সে পদার্পণ করলে তার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করো। আমরা অনেকে মনে করি, শৈশব থেকে যদি সন্তান-সন্ততিদের যথেষ্ট শাসন-তর্জনের মধ্যে রাখা যায়, তা হলে তারা সুবোধ, শান্ত-শিষ্ট এবং অনুগত হতে বাধ্য এবং তা তাদের ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির পথে একান্ত সহায়ক। কিন্তু ধারণাটি যুক্তির ধোপে টেকে না। বাবা-মার কঠোর শাসনে ছেলেমেয়েরা বশ্য হতে বাধ্য হয় বটে, সেই বাধ্যতার তলে তলে একটা প্রচন্ড ভীতি লুকিয়ে থাকে। যে ভয়-ভীতি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। শিশু ফাঁক খুঁজতে থাকে। সে চেষ্টা করে বাপ মার শাসনচক্রের বাইরে গিয়ে আপন ইচ্ছামত কিছু করার। ঠিক সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয় একটি গ্রাম্য প্রবাদ –

'বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো।'

দরিদ্রতা অপরাধ নয়। অনেক অভিভাবকই তাঁদের সাধ থাকা সত্ত্বেও সাধ্যের অভাবে ছেলেমেয়েদের শৈশবে প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন না। কিন্তু গুণ-শীল-আচরণ তো কেতাবি শিক্ষা নিরপেক্ষ। কাজেই হতাশ না হয়ে, আমরা, যারা দারিদ্র্য রোগাক্রান্ত, অল্পক্লেশে সন্তানদের সাধ্যমত প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থার পাশাপাশি তাদের সদাচরণের শিক্ষা দিতে পারি। তাই অতি সাধারণ আর্থিক যোগ্যতাসম্পন্ন পিতামাতাকে সচেতন করে দিয়ে গ্রাম্য-ছড়া বলে –

'না পড়াবি পো,
তো সহবতে নিয়ে থো।'

এতক্ষণ পর্যন্ত গ্রাম্য ছড়া-প্রবাদ-প্রবচনগুলি যা কিছু বলেছে, তা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে। কিন্তু মনের সঙ্গে শরীর যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সে সত্যকেও স্বীকার করে গ্রাম্য ছড়া-প্রবাদ-প্রবচনগুলি। শিশুর স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে শিশুর খাদ্যের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। আর সে ব্যাপারেও গ্রাম্য ছড়া যে সহজ সরল এবং ছন্দোবদ্ধ পরামর্শ দান করে, তা উপেক্ষণীয় নয়।

আমাদের অনেকের ধারণা, শিশুদের সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী করে তুলতে হলে তাকে যথেষ্ট খাদ্য এবং পানীয় সামগ্রী গলাধঃকরণ করাতে হবে। দেখা যায়, অনেক সময় আমরা 'যথেষ্ট'র সীমারেখা পার হয়ে শিশুদের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য-সামগ্রীতে তাদের উদরপূর্তির ব্যাপারে যত্নবান হই। মনে করি, শিশুকে যত বেশি খাওয়ানো যাবে, তত বেশি সে স্বাস্থ্য অর্জনে সমর্থ হবে। কিন্তু আমাদের বোধহয় একথা ভুললে চলে না যে, শিশুর পরিপাকের যন্ত্রটিও ক্ষমতায় শিশু। কাজেই, অধিক খাদ্য যদি তার পরিপাকের বিরোধ ঘটায়, তা হলে তা তাকে স্বাস্থ্যলাভের বদলে স্বাস্থ্যহীনই করে তুলবে। তাই শিশুর পরিমিত খাদ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে এই গ্রাম্য ছড়াটি –

'উনো ভাতে দুনো বল,
ভরা ভাতে রসাতল।'

অর্থাৎ পরিমিত খাদ্য পরিপাকে বিঘ্ন না ঘটিয়ে দ্বিগুণ শক্তি দান করবে। কিন্তু ভরপেট খাদ্য গরহজমের ফলে বিপরীত ক্রিয়া ঘটিয়ে শিশুর শরীরে খাদ্যগ্রহণের আসল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে।

ইহলোকের অন্তরালে। সমাজের একশ্রেণীর মানুষদের বাড়িতে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর দুপুরে বিশ্রাম না করে ঘণ্টা দু-তিনেকের জন্য অনুমতি নিয়ে এখানে চলে আসেন। অনিশ্চিত অন্ধকার জীবনকে একটু আলোকের পথে চালিত করার জন্য। বেশিরভাগ মহিলারাই আশেপাশের বস্তিবাসী। গরিব। কোনরকমে লজ্জা নিবারণের মতো পোশাকে আবৃত তাঁদের মলিন দেহগুলো। কথা হচ্ছিল বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকা রেখা নাগের সংগে। তিনি জানালেন, 'সর্ব সাকুল্যে চল্লিশ জন ছাত্রী, তবে প্রতিদিন পনের ষোল র বেশি আসে না। কারণটা খুব সহজেই অনুমান করতে পারবে। কেননা তারা তো বাড়ির (যেখানে কাজ করে) অনুমতি সব সময় পায় না সেই কারণেই উপস্থিতি-র হার মাঝে মাঝে কমে। কিন্তু পরে এসে তারা সতীর্থদেব কাছ থেকে পুরনো পড়া সব জেনে নিয়ে মুখস্থ করে ফেলে। এই মুখস্থ করার পেছনে একটা রহস্য আছে। কারণ তারা ভালভাবেই জানে যে, ছমাস পর পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে তাদের সেলাই মেশিন দেওয়া-হবে না।' রেখা দেবী আরোও জানালেন যে, এই ছ'মাসের শিক্ষাকালে তারা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারে তিনি একটু ক্ষোভের সংগে জানালেন, 'যদি কেউ একবছর পড়াশুনা করে তবে তো সোনায় সোহাগা কিন্তু অনেকে তা করে না মেশিন পাবার পর অনেকে লেখাপড়ার পাঠ শেষ করে দেয়। তবে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে পড়ার প্রতি আরোও আগ্রহ বাড়াতে পারি।'

এখানে কীভাবে ভর্তি এবং কখন সেলাই মেশিন দেওয়া হয় সে প্রসংগে জানতে চাইলে সহকারি সম্পাদিকা তপতী দত্ত জানালেন, জানুয়ারি থেকে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি শুরু হয়। আবেদনকারীদের গরিব হতে হবে এবং সহায়সম্বলহীন অবশ্যই প্রথমে আমরা ছ'মাস লেখাপড়া শেখাই। এবং পরীক্ষাও নিই। পাশ করলে ছ'জনকে সেলাই শেখানোর মেশিনের কাজে বসাই। সেই সময় তাদেরকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়। এ টাকা দেন লুথারান গোষ্ঠী। ছ'মাস সেলাই শেখার পর শিক্ষার্থীদের সঞ্চিত ৩০০ টাকা আর লুথারান গোষ্ঠীর আরোও ৫০০ টাকা দেয়। মোট আটশ টাকা দিয়ে মেশিন কিনে তারা ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হন। যে সব ছাত্রীদের মেশিন দেওয়া হয় তা আর কোনদিন ফেরত নেওয়া হয় না।' ছ জন ছাত্রীকে কেন মেশিন দেওয়া হয় এর বেশি কেন দেওয়া হয় না এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সলিলবাবু জানালেন, 'লুথারান তো শুধু আমাদেরকেই সাহায্য করে না আরোও অনেক স্কুলে তারা সাহায্য করে। তবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে ছয় থেকে আরোও বেশিতে আনা যায় কিনা।' রমেশ রায়ের স্ত্রীর দেওয়া সাড়ে ছ'কাঠা জমির উপর এই স্কুল এখন রমরম করে চলছে এগিয়ে চলছে কাটিং এবং লেডি ব্রেবোর্ন ডিপ্লোমা কোর্স। কোন প্রবেশ মূল্য নেই। তবে যাঁরা



কাটিং এবং ডিপ্লোমা কোর্স করতে চান তাদেরকে একটু লেখাপড়া শিখতে হবে। শিক্ষান্তে সরকারি প্রশংসাপত্র এবং বিভিন্ন সংস্থায় যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয় তা থেকে তারা পয়সা উপার্জন করে। অভাবের সংসারে হা ভাতেদের মুখে তুলে দিতে সমর্থ হন দুমুঠো নুন ভাত। যেসব মহিলারা অষ্টম শ্রেণী কিংবা তদূর্ধ্ব লেখাপড়া শিখেছেন তাদের জন্যও এখানে কাজ শেখার সুবন্দোবস্ত আছে। হাসপাতালের সেবিকার কাজ। বর্তমানে এখানে দশজন ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করছেন। আট মাসের কোর্স। গাড়ি ভাড়া বাবদ প্রতিদিন তিন টাকা করে প্রতিটি ছাত্রীকে দেওয়া হয়। আট মাসের পর একটি প্রশংসা পত্র দেওয়া হয়। এই প্রশংসাপত্রের সাহায্যে অনেক ছাত্রী সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিং হোমে চাকরি পেয়েছেন বলে জনা গেল।

সলিলবাবু, রেখা দেবীর মতো প্রতিষ্ঠানের জন্ম লগ্ন থেকেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষের স্ত্রী শীলা ঘোষ তিনিও এখানকার শিক্ষিকা একজন। তাঁর দানও কম নয়।

শুধু মহিলা বললে ভুল হবে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য পুরুষদেরও অবাধ সুযোগ আছে এখানে। যারা মোটামুটিভাবে একটু লিখতে পড়তে পারে তাদের টাইপ মেশিন সারানো শেখানো হয় সময়সীমা ছ'মাস। প্রতিদিন যারা আসবে তাদের তিনটাকা হারে দেওয়া হয় এবং যারা টাইপ শিখতে আগ্রহী তাদেরও দশমাসের সীমিত সময়ের কোর্সে টাইপ শেখানো হয় পরিবর্তে তিনটাকা প্রতিদিন দেওয়া হয়। শিক্ষান্তে সার্টিফিকেট সহ সাজসরঞ্জামও কিনে দেন এই সংস্থা। শুধু তাই নয় নানা রকম অফিসের সংগে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে চাকরির ব্যবস্থাও করে দেয়। রেডিও টি ভি র ক্ষেত্রেও তাই। তবে মাধ্যমিক বা সমতুল অবশ্যই হতে হবে।

সলিলবাবুর একটি কথা অবশ্যই উল্লেখ করতেই হয়, তাঁর আশা সরকার যেন এব্যাপারে আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। যেখানে বেকারত্বের জ্বালা, স্বামীহীন, গরিবদের জন্য এগিয়ে এসে পাইকপাড়া সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র কলকাতায় এক নজির সৃষ্টি করেছে তাদের অবশ্যই সরকারি সহযোগিতা পাবার দাবি আছে। জানি না এ ব্যাপারে সরকার কতটা সহযোগিতা করবে। □

অশোক সেন

ছবি : প্রতিমা মান্না

রূপচর্চা

গরমের দিনে রূপচর্চা

রত্না বহুগুনা

গরমকালে ত্বক পরিচর্চার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা, তা হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা গরমকালে সাধারণত দেহের তাপমাত্রা বেশি থাকে ফলে সিবেসিয়াস গ্রন্থি অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ত্বকের তৈলক্ষরণ বেশি হয়। আর স্বাভাবিকের চেয়ে তৈলক্ষরণ বেশি হলে ব্রন বা



হিট র‍্যাশ দেখা দিতে পারে, মুখের চামড়া কালো হয়ে যেতে পারে। আবার গরমে যদি ত্বক যথাযথভাবে পরিষ্কার না করা হয়, তাহলে একরকমের ডেডসেলও চামড়ার মধ্যে জমা হতে থাকে — যা ত্বকের সুস্থতা বা স্বাভাবিক সৌন্দর্যের পথে অন্তরায় হয়। আর বলাই বাহুল্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শুধু দেহের বাইরে নয়, ভিতরেও। গ্রীষ্মে দেহের অত্যধিক তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জল খেতে হয় যথেষ্ট পরিমাণে। ঠান্ডা পানীয়, ফলের রস তো বটেই, এছাড়াও খুব উপকারি হিমশীতল জলে দু চামচ মধু মিশিয়ে খাওয়া। পেঁপে হজমের পক্ষে অব্যর্থ। সেই সঙ্গে তপ্ত হাওয়া থেকে বাঁচতে টক জাতীয় জিনিস। নিদেনপক্ষে টকের বিকল্প হিসেবে ভিটামিন সি-ও খাওয়া চলতে পারে।

গ্রীষ্মে স্নানের প্রয়োজন একাধিকবার অবশ্যই। খুব ভালো হয় ঠান্ডা জলে কয়েকটি নিমপাতা বা কয়েকটুকরো ফটকিরি ফেলে দিলে। এতে স্নানের জল খুব নির্মল হয়ে ওঠে, শরীরের গ্লানি জুড়িয়ে যায়। মাথায় তেল গরমে না দেওয়াই ভালো। শ্যাম্পু তিনচার দিন অন্তর করলে ভালো হয়। আর স্নানের পর ভালো ট্যালকম পাউডার সারা গায়ে, পায়ের আঙুলের ফাঁকে ছড়িয়ে দিলে আরাম হয়, ত্বকও পরিচ্ছন্ন থাকে।

এবার আসি মুখের প্রসাধনের কথায়। গরমে রোদে ঘামে ধুলো বালিতে মুখে অসম্ভব ময়লা জমা হয়। আর এই ময়লার কারণেই ত্বক রুক্ষ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। অসুস্থতা ক্লেদ আর গ্লানির ছাপ ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে। জল দিয়ে সাবান দিয়ে মুখ ধুলে মুখের ওপরের ত্বক কিছুটা পরিষ্কার হয় ঠিকই, কিন্তু ভিতরের ময়লা যেমনকার তেমনিই থেকে যায়। সুতরাং মুখের এই যাবতীয় ময়লা টেনে বার করার জন্য দরকার ফেসমাস্ক। এই মাস্ক পিঠে হাতে বা গলাতেও লাগান যেতে পারে। এতে ত্বকের ওপরের











ধুলোবালি ময়লা তো বটেই ভিতরের ময়লাও বেরিয়ে আসে। অনেকের ধারণা ত্বক তৈলাক্ত হলে গরমকালে ময়শ্চারাইজার লাগান উচিত নয়। ধারণাটি ঠিক নয়। আসলে তৈলাক্ত অর্থাৎ তেল জাতীয় প্রসাধনীর সংগে ময়শ্চারাইজারকে মিশিয়ে ফেলাটাই ভুল। তেল জাতীয় প্রসাধনী গ্রীষ্মে বর্জন করা উচিত।কিন্তু ময়শ্চারাইজার ত্বকের পরিচর্যার পক্ষে সব ঋতুতেই সমান উপকারী। মনে রাখবেন ময়শ্চারাইজার ত্বককে কোমল করে তোলে। এমনকি যাঁদের মুখে বালরেখা আছে তাঁরা হয়তো এই ভেবে চিন্তিত যে কিভাবে মুখের প্রসাধন করবেন ইত্যাদি। তাঁদেরও বলি ময়শ্চারাইজার যে কোনো ত্বকের পক্ষেই খুব উপকারী।

সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে গরমে মুখের চড়া মেকআপ না করাই ভালো। এক্ষেত্রেও আমার ফর্মূলাটা একটু ভিন্ন। গরমেই বরঞ্চ ত্বকের প্রসাধন বেশি করা উচিত। ক্যালাড্রিল বা ল্যাকমে ফাউন্ডেশনের ওপর পাতলা করে ট্যালকম পাউডার মাখলে গ্রীষ্মে ত্বক ভালো থাকে। আসলে গ্রীষ্মে মুখের প্রসাধন না থাকলে ময়লা ধুলো বালি সহজেই ত্বককে অপবিচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। তাই চড়া রোদ বা ধুলো ময়লা থেকে ত্বককে বাঁচানোর জন্যও গ্রীষ্মে মুখের প্রসাধন জরুরি।

এই ক্যালাড্রিল লোশন পুরুষরাও ব্যবহার করতে পারেন। তবে জিংক অক্সাইড বা বোরিক অ্যাসিড আছে এরকম কোনো ক্রিম বা লোশন ব্যবহার না করাই ভালো। তাছাড়া ক্যালাড্রিল লোশন জলের সংগে মিশিয়ে রাতে শোবার আগে মেখে শুলেও হিট র‍্যাশ থেকে দূরে থাকা যায়। অনেকেরই ব্রনর সমস্যা থাকে। গ্রীষ্মে তা বাড়ার সম্ভাবনা। সুতরাং মুখের ত্বক যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখাটাই বাঞ্ছনীয়। ঘামাচির সমস্যার জন্য ভালো যে কোনো পিকলি হিট পাউডার। গাঢ় বাদামী রঙের মাইশোর চন্দন সাবান গ্রীষ্মে ব্যবহার করা খুব ভালো। কারণ এর মধ্যে অ্যাসট্রিঞ্জেন্ট জাতীয় পদার্থ আছে যা ত্বকের অত্যধিক তৈলক্ষরণকে প্রতিরোধ করে। অবশ্য গোলাপজলেও অ্যাসট্রিঞ্জেন্ট এর কাজ হয়। বিশেষ করে বোরিক তুলো গোলাপজলে ভিজিয়ে মুখে বোলালে ত্বক খুবই পরিচ্ছন্ন আর মোলায়েম থাকে।

গ্রীষ্মে চুল বাঁধার কায়দাও পরিচ্ছন্নতার লক্ষণ। চুল ছোট থাকলে গ্রীষ্মে তাকে পরিষ্কার রাখা সহজ। বড় থাকলে বিনুনির থেকে টপনটই শ্রেয়। এতে দেখতে লাগে ছিমছাম, চুলও পরিষ্কার থাকে।

মেকআপের ক্ষেত্রে অবশ্যই হাল্কা শেড এবং পেল কালার মেকআপ। যাঁদের রঙ ময়লা, তাঁরা যে ধরনের মেকআপ সাধারণত ব্যবহার করে থাকেন সেটিই ব্যবহার করুন। তবে মেকআপ অবশ্যই হওয়া চাই ওয়াটার প্রুফ, যাতে ঘামে তা নষ্ট না হয়। □

রত্না বহুগুনার সৌজন্যে

ছবি : শংকর নাগ দাস

খেলা

মেয়েরা দিন দিন ক্রিকেট প্রেমী হচ্ছেন

টুলটুল আমার পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। বয়স বেশি নয়। ফুটফুটে বাড়ন্ত গড়নের মেয়ে টুলটুলের বয়স মাত্র ন বছর। স্পাইডারম্যান বা রামায়ণ টিভি তে দেখতে যতটা ভালবাসে তার চেয়ে শতগুণ ভালবাসে ক্রিকেট দেখতে। টেস্ট বা ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনালের ক্যালেন্ডার ওর জিভের ডগায়। কোন দলে কে এল, কার বদলে কে, খারাপ ফর্মের জন্য কে বাদ গেল, কেই বা নির্বাচকদের কোপের বলি হল তা ও জানে। ম্যাগাজিন থেকে রঙিন ছবি আর পেপার কাটিং জমিয়ে রাখে। সুনীল গাভাসকরকে নিয়ে হিন্দুস্থান যতই গর্ব করুক টুলটুল ভালবাসে আজহারউদ্দিনকে। আজাহার ভাল খেললে বলে – 'ও ছাড়া আছে কে?' খারাপ খেললে শুনি 'খেলোয়াড়দের রোজ যে ভাল খেলতে হবে এমন কোন কথা আছে।' আমরা মাঝে মাঝে ওকে ক্ষ্যাপানোর জন্য বলি – 'তোর আজাহারকে আর ইন্ডিয়া টিমে ঢুকতে হচ্ছে না।' আমাদের সংগে ওকে ক্ষ্যাপান ওর মা, আমাদের ছন্দা বৌদিও। টুলটুল 'ইস' বলেই আমাদের তাড়া করে। শুধু কলকাতা নয়, ভারতে আজ এমন টুলটুলের সংখ্যা প্রচুর।

ক্রিকেট মাঠে যত মেয়ে দেখা যায় তত আর কোনো খেলায় দেখা যায় না। শুধু হালে নয়, চিরদিনই তাই। কারণ অনেক। ক্রিকেটে এমন এক শিল্প-সুষমা লুকিয়ে আছে যা আর কোনো খেলায় নেই। থাকলেও তা ধরা পড়ে না। ক্রিকেটের মত টেনিস খেলোয়াড়রা স্মার্ট হলেও টেনিস একটা গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না।

ফুটবলও জনপ্রিয় খেলা। কিন্তু ক্রিকেটের চেয়ে কি? এই প্রশ্নের জবাব সময়ের অপেক্ষা রাখে। ফুটবল খেলে পৃথিবীর প্রায় সব কটি দেশ। আর ক্রিকেট দশটি দেশও নয়। তবু ক্রিকেট জনপ্রিয়। বিশেষ করে মেয়েদের কাছে। ক্রিকেটকে ভালবেসে মেয়েরা ক্রিকেটারদেরও কাছাকাছি আসতে চান। কলকাতায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর যখন বসে তখন হোটেলে বা মাঠে অটোগ্রাফ বুক হাতে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদেরই বেশি দেখি পুলিশ বা নিরাপত্তাবাহিনীর কর্মীরা সাংবাদিকদের পরিচয়পত্র দেখেও তাকে মাঠে বা হোটেলে ঢুকতে দিতে সাতবার ভাবেন। কিন্তু শয়ে শয়ে মেয়েদের কাছে তারা জলে জল।



ন'বছর আগে ইরানী ট্রফিতে বাংলার বিরুদ্ধে খেলতে আসা হরিয়ানা দলের এক অল রাউন্ডারকে দেখেছি কীভাবে তিনি বান্ধবী পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। সব মেয়েই শিক্ষিতা। সুন্দরী। অভিজাত পরিবারের।

ভারতীয় ক্রিকেট দলে নতুন কেউ ঢুকলে তাকে চিনে রাখেন, মনে রাখেন মেয়েরা। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল দলের ক্ষেত্রে একথা খাটে কি? গাভাসকর - কপিলদেব - রবি শাস্ত্রী - বেংগসরকার নামগুলির পাশাপাশি সুদীপ চ্যাটার্জি-বিকাশ পাঁজি-কৃশানু দে-তরুণ দে নামগুলিকে ছোট না করেও বলব মেয়েদের কাছে নামগুলি অবশ্যই অচেনা। হয়ত ক্রিকেটারদের পাশে বেমানানও।

সুদীপ চ্যাটার্জি মোহনবাগানে সই করে ভুল কাজ করেছেন না করেননি তা নিয়ে বিন্দুবিসর্গ ভাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না কোন মেয়ে। কিন্তু দিলীপ বেংগসরকরের শাস্তি ছেলেদের মত অনেক মেয়েকেও ভাবিয়েছে। চিমা কৃশানুর সম্মিলিত আক্রমণ বিপক্ষের ডিফেন্সকে নারকেলের মত ফালা ফালা করবে কি না তা নিয়ে আদৌ কিছু ভাবতে নারাজ যাদবপুরের সবিতা নাগ। বরং বলেন 'চেতন শর্মা জোরের সংগে সুইংটা ভাল না করলে ওর পক্ষে ইন্ডিয়া টিমে টিকে থাকা কঠিন হবে।'

টুকরো টুকরো এরকম অনেক কথা, অনেক ঘটনায় বোঝা যায় দিন দিন মেয়েরা ফুটবলকে লাথি মেরে ক্রিকেট দেখছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর আলি খাঁর (পাতৌদি) সংগে বিয়ে হল রুপোলি পর্দার সেক্সি হিরোইন শর্মিলা ঠাকুরের। রাজেশ খান্নার প্রাক্তন প্রেমিকা অঞ্জু মহেন্দ্রু একটু ঢলে পড়ার চেষ্টা করেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন অধিনায়ক গ্যারী সোবার্সের দিকে। সন্দীপ পাটিল দেবশ্রী রায় এক সময় দুজন দুজনের মনের মানুষ হয়েছিলেন। ফুটবল এমন উদাহরণ দিতে অক্ষম।

তবে কি ফুটবলারদের সঙ্গে ভালবাসা করে কারো বিয়ে হয় না? হাঁ হয়। বরং বেশিই হয়। সাধারণ মানুষের চেয়ে একজন ফুটবলারের নাম, ধাম, টাকা বেশি। মেয়েরা রেগে গেলেও বলব – তারা কিছুটা এসবের দিকেও ঝোঁকেন। একথা হয়ত ঠিক, অরুণলাল অবিবাহিত হলে আজ অনেক মেয়ের প্রেমপত্রই ওকে সামলাতে হত। কিন্তু ভারতের একজন ফুটবলারও

আছেন কি যার কাছে রোজ কিছু মেয়ে টেলিফোনে বা চিঠিতে বলছে – 'আমি আপনাকে চাই।'

তবু যে ফুটবল অন্ত প্রাণ কয়েকজনমহিলাকে দেখিনি তা নয়। মহমেডান স্পোর্টিং-য়ের হয়ে সমরেশ চৌধুরী যে বছর দারুণ খেলে ইস্ট বেংগলকে আটকে দিলেন সেবার ম্যাচের পর কান্নায় ভেঙে পড়ে এক মহিলা বলেছিলেন – 'পিন্টুই (সমরেশের ডাক নাম) তো আজ এইভাবে ইস্টবেংগলকে বাঁচাতে পারত।' ৭৬-য়ে লিগ চ্যাম্পিয়ন হবার পর মোহনবাগান তাঁবু যখন উল্লাসে ফেটে পড়ছে তখন মাঝবয়সী এক ভদ্রমহিলাকে দেখলাম বাক্স বাক্স সন্দেশ নিয়ে সকলকে খাওয়াচ্ছেন। নিজের গলার সোনার সরু চেনটা পরিয়ে দিলেন উলগানাথনের গলায়। কিংবা ধরা থাক জয়শ্রীদির কথা। জয়শ্রী সেন। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট শ্যামল সেনের স্ত্রী। ফুটবল যতটা ভালবাসেন তার চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসেন ইস্টবেংগলকে। প্রকৃতির অবস্থা যেমনই থাক জয়শ্রীদির মাঠে আসা চাই। সুরজিত সেনগুপ্ত যখন যে দলে খেলেছেন তখন সেই দলের খেলা দেখেছেন নিয়মিতভাবে। সুরজিতকে তিনি নিজের ভাইয়ের মতই ভালবাসেন। টিভি-তে মাঝ রাতে বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলাগুলি দেখার জন্য দুপুরে ঘুমিয়ে নিতেন। খেলার মাঠে দাংগা হাংগামা, খেলা নিয়ে ছেলেখেলা প্রভৃতি দেখে জয়শ্রীদি মাঝে মাঝে ভাবেন মাঠের সংগে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবেন। কিন্তু আজ অবধি পারেননি। ওপরে বলা ঘটনাগুলিতে ফুটবলটা একটু ফুলতে পারে কিন্তু তা নিয়ে হৈচৈ করার মত কিছুই নেই। কারণ – সংখ্যাটা কোটিতে গুটির মত।

কথা হচ্ছিল গায়িকা শ্রাবন্তী মজুমদারের সংগে। শ্রাবন্তী বলছিলেন – 'ফুটবল বা ক্রিকেট দুটির কোনটিই খুব ভালবাসি না। সব খেলাই দেখি। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, র‍্যাকেট ক্লাবে স্কোয়াশও। অ্যাথলেটিক্সও ভালবাসি। আগে লাইন দিয়ে টিকিট কেটে, ঘোড়ার তাড়া খেয়ে, তার লাথি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ক্রিকেট খেলা দেখেছি। ইন্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া, ইন্ডিয়া-ইংল্যান্ড টেস্ট ম্যাচগুলি এইমাত্র বলা ঘটনার সাক্ষী। এখন সময় কম। কাজ বেশি। মনটাও বদলে গেছে। কাজের ফাঁকে স্কোর জানি।



ফুটবলেরও ইস্টবেংগল হারলে একটু খারাপ লাগে। ক্রিকেট ভালবাসি। তবে ক্রিকেটারের সৌন্দর্যের জন্য নয়। ইমরান খাঁ-র রূপে পাগল হয়ে যারা নিজেদের ক্রিকেটপ্রেমী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন আমি তাদের দলে নই। ক্রিকেটটা আমার কাছে স্ট্যাটাস সিম্বলও নয়। তাই রাজ্যের কাজ শিকেয় তুলে ক্লাব হাউসে বসে ভাবলাম 'স্ট্যাটাস্ বাড়ল' – না আমি সেই মেয়ে নই। বরং টিকিটটা এমন একজনকে দেব যে খেলা বোঝে। ভালবাসে। আর সেই সময়টা আমার গান গাইলে কাজে দেবে। দেখুন, ফুটবলে আমাদের গলা বাড়িয়ে বলার মত কিছুই নেই। ক্রিকেটে তা কিছুটা আছে। তবে কতদিন থাকবে তা সন্দেহ। আজ চমৎকার খেলল। কাল গো হারা হারল। চার বছর আগে যারা বিশ্বকাপ জিতল এবছর তাদের খুঁজে পাওয়া গেল না। আসলে আমাদের ক্রিকেটারদের আস্থাটা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি এসে গেছে বলেই এই অবস্থা। এ সত্ত্বেও শ্রাবন্তী স্বীকার করলেন, মেয়েদের কাছে ক্রিকেট ফুটবলের চেয়ে প্রিয়। তার কারণ ক্রিকেটে গ্ল্যামার বেশি। প্রচার বেশি।



ফুটবলারদের চালচলন, কথাবার্তায় টিপিক্যাল বাঙালীর ছাপ থাকে। ক্রিকেটারদের মধ্যে তা নেই। মোদ্দা কথা, ফুটবলাররা যদি স্মার্ট হন ক্রিকেটররা তবে স্মার্টার।'

বেতারের ঘোষিকা আর টিভি-র সংবাদ পাঠিকা ছন্দা সেন (এখন চৌধুরী) কিছু বলার আগে উল্টে প্রশ্ন করেন – 'আচ্ছা আরেকটা চুনী, আরেকটা পি কে হয় না কেন বলুন তো? কিংবা সমাজপতি। ওর প্রশ্ন থেকেই বোঝা গেল মনে রাখার মত ফুটবল বা ফুটবলার আজ আমরা সেভাবে পাচ্ছি না বলেই আজ ফুটবলের জায়গাটা ক্রিকেট গ্রাস করেছে। ছন্দা বলছিলেন – 'বছরে একটা টেস্ট ম্যাচ দেখার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। ফুটবলে তেমন কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট এই সেদিন পর্যন্ত ছিল না। ফলে স্বভাবতই ক্রিকেটে মেয়েদের আগ্রহটা বেশি ছিল। ফুটবল মাঠে গিয়ে দেখার সুযোগ হত না। কারণ – দুটি বড় দলের খেলায় গণ্ডগোল প্রায় লেগেই থাকে। সেদিক থেকে ক্রিকেট অনেক বেশি নিরাপদ। খেলাটার ভেতরও শান্ত ভদ্রতার ছাপ পাওয়া যায়। তাছাড়া ক্রিকেট মাঠে যাওয়ার সংগে ভারতীয় দলের সম্পর্ক হয়েছে। জিতলে সকলের আনন্দ। হারলে সকলেরই বিষাদ। একটা জাতীয়তাবোধ জড়িত আছে ক্রিকেটের সংগে। ও ফুটবল ভাল না লাগার কারণ মানি। কোথায় নেমে গেছে বলুন তো। মেয়েদের ক্রিকেট ভালবাসার আরো একটা কারণ দেখালেন ছন্দা। 'একজন মেয়ে ক্রিকেট মাঠে যাবার জন্য মা-বাবা দাদা দিদি সকলকে সংগী হিসেবে পাচ্ছেন। স্বামী স্ত্রী মিলেও ক্রিকেট মাঠে যান। এ দৃষ্টান্ত ফুটবলে পাওয়া যায় কি? আমি আজ সংসার আর অফিসের কাজের জন্য মাঠে যেতে পারি না। কিন্তু চোখ দুটো খোলা। আর মাঠে গিয়ে খেলা দেখার অভিজ্ঞতাও আছে।'

শ্রাবন্তীর মত ছন্দাও স্বীকার করলেন ক্রিকেটের গ্ল্যামার, প্রচার ফুটবলের চেয়ে অনেক বেশি। আর সেই কারণেই হয়ত ওর (ছন্দা) একরত্তি মেয়ে তিতলি এই বয়সে ক্রিকেটের প্রেমে পড়ে কপিলকে বলছে – 'কোকিল দেব'।

চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়

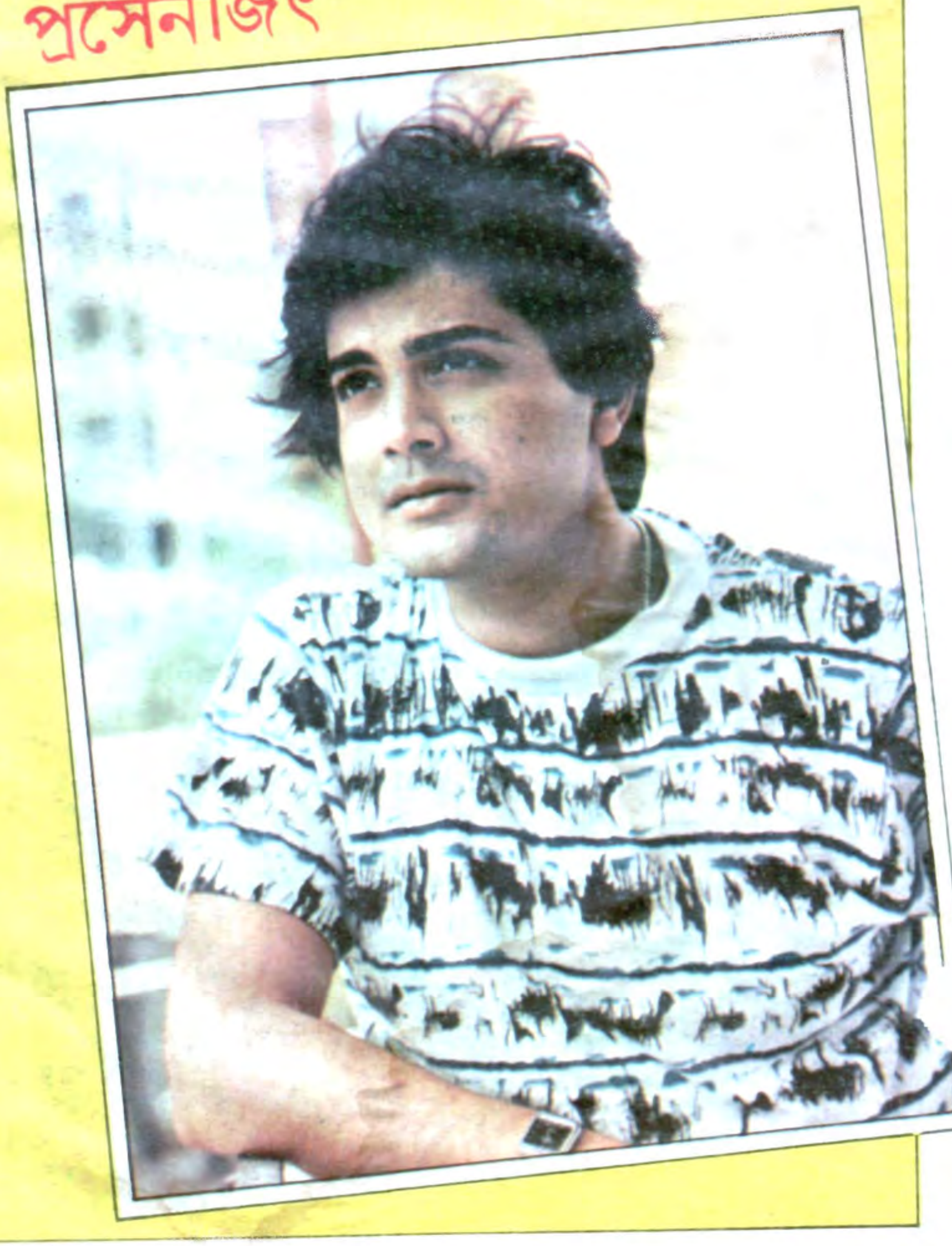
মুখোমুখি

গ্ল্যামার নয়, অভিনয় করতে চাই : প্রসেনজিৎ

এ বছরের গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাংলা ছবি তরতরিয়ে এগোচ্ছে। ১৯৮৬ সাল থেকে বাংলা ছবির পালে যে হাওয়া লেগেছে, এবং সেই হাওয়ায় ছবির নৌকা যেভাবে একটার পর একটা বক্স অফিস হিট করেছে, তার ফলে টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়া রীতিমত গমগম করছে। আর বক্স অফিসের সাম্প্রতিক কালের রেকর্ড করা ছবিগুলির অনেকগুলিরই নায়ক প্রসেনজিৎ।

বাবা বিশ্বজিৎ এক সময় বাংলা ছবির জগতে যেভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তস্যপুত্র প্রসেনজিৎ সেই পথই অনুসরণ করছেন, বলা যায়। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, প্রসেনজিৎ বাবার কাছ থেকে কোনো রকম সাহায্য পাননি। চানওনি। মা রত্নাদেবী এখন প্রসেনজিতের একমাত্র গার্জিয়ান – তিনিই এখন প্রসেনজিতের একমাত্র প্রশ্রয়দাত্রী। মায়ের আশীর্বাদ, স্নেহ ও উপদেশ প্রসেনজিৎকে সব সময় এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

ছবিতে অভিনয়ের হাতেখড়ি বাবা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ছবি 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'-তে নায়কের চরিত্রে। তারপর পড়াশুনার জন্য দীর্ঘ ছুটি। তবে এরই মধ্যে চুটিয়ে অভিনয় করেছেন নাটকে। বাড়িতে অভিনয়ের পরিবেশ ছিল। খুব কাছ থেকে দেখেছেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও পরিচালকদের। নিজেকে এর ভেতর কখন যে গড়ে নিয়েছেন – তা প্রসেনজিৎ মনে করতে পারেন না। তবে সাংসারিক প্রয়োজনেই ওঁকে হঠাৎ ছবির জগতে চলে আসতে হয়েছে। নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার সময় পাননি তখন। প্রসেনজিৎ নিজেই বলেন,



আরো দুবছর পরে এলে ভাল হত।

তবুও এলেন এবং বেশ কিছুদিনের মধ্যেই বাংলা ছবির অপরিহার্য নায়ক হয়ে উঠলেন। সাম্প্রতিককালের সফল ছবিগুলি দেখলেই একথা বোঝা যায়।

যেহেতু নাটকেই মূলত অভিনয়ের হাতেখড়ি, সেজন্য নাটকই এখনও পর্যন্ত ওর কাছে হট ফেভারিট। ১৯৮৪ ৮৫ সালে স্টার থিয়েটারে 'সমাধান' নাটকে অভিনয় করেন নায়কের ভূমিকায়। বিপরীতে ছিলেন কল্যাণী মন্ডল ও মঞ্জু চক্রবর্তী। এখন ওয়ান ওয়াল থিয়েটারে অভিনয় করছেন নিয়মিত। অফারও আছে বেশ কিছু। কিন্তু সময়ের অভাবে মঞ্চের হাতছানি উপেক্ষা করতেই হচ্ছে।

প্রসেনজিৎকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ছবিতে অভিনয় করতে এসে অনেককেই নানা ধরনের বাধা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় আপনাকে এধরনের কোন প্রবলেম ফেস্ করতে হয়েছে কী

প্রসেনজিৎ তার স্বভাবসুলভ হাসি ছড়িয়ে দৃঢ় স্বরে জবাব দিলেন, না, কোন প্রবলেম ফেস্ করতে হয়নি। আমার কোন প্রবলেম নেই। ছিল না, এখনো নেই। ইনডাসট্রিতে ফ্রম আর্টিস্ট টু টেকনিসিয়ান্স সকলেই আমাকে ভালবাসেন। আমার দায়িত্ব তাকে রক্ষা করা।

কথা প্রসংগে প্রসেনজিৎ বললেন, অভিনয়টাকে আমি সিরিয়াসলি নিই। গ্ল্যামারের লাইন হিসেবে নিইনি। আমি গ্ল্যামারের পেছনে ছুটছি না। আমি অভিনয় করতে চাই, শিল্পী হিসেবে নিজেকে বিকশিত করতে চাই। এটাই আমার ইচ্ছে।

– পরিচালক হবার শখ নেই ?

– ছোটবেলায় পরিচালক হবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হিরো হয়ে গেলাম। তবে ছবি করব। তার আগে অনেক কিছু শেখার আছে। আগে শিখি। বছর পনেরো পর ভাবব ডিরেকশন দেব কি না।



শতাব্দী রায়ের সংগে প্রসেনজিৎ

প্রসংগত প্রশ্ন ছিল : আপনি তো যুবক। যুবসমাজের এই অবক্ষয় কেন আপনি কি এসব নিয়ে কোনদিন কিছু ভেবেছেন

প্রসেনজিৎ এবার একটু ভাবলেন। সত্যিই ভাবলেন। এবং খুব ধীরে উত্তর দিলেন, অবক্ষয়ের মূল কারণগুলো আমার মতে (এক) সিস্টেমের দোষ যে সিস্টেমে সমাজ চলছে, এভাবে চলতে পারে না। এটা পাল্টানো দরকার। (দুই) বিক্ষিপ্ত মানসিকতা, (তিন) সব কিছু চাপিয়ে দেওয়া। আমাদের ওপর, যুবকদের ওপর এমনভাবে বাজে কিছু জিনিস চেপে বসছে বা বসানো হচ্ছে, যা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হচ্ছে না। আর এসব কারণেই ড্রাগের নেশা বাড়ছে। কোন কিছু না পেয়ে আরো অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছি আমরা। আবার দেখুন, হঠাৎ কিছু করে ফেলছি আমরা, এটা হঠকারি হয়ে যাচ্ছে। অনেকে তাই বলছেন। আমি রাজনীতি করি না। বুঝি না আমার অত সময়ও নেই। তবে কলেজের বন্ধুদের সংগে এ নিয়ে অনেকসময় কথা বলেছি। বন্ধুদের মতে, গার্মেন্টশিল্পের অভাব। এই অভাবের জন্যই বিশৃংখলতা বাড়ছে।



প্রসেনজিৎ দেবশ্রীর সঙ্গে

প্রসেনজিতের প্রিয়

লেখক : আগাথা ক্রিস্টি।
মানুষ : মা।
অভিনেতা : সঞ্জীবকুমার, উত্তমকুমার, উৎপল দত্ত।
অভিনেত্রী : জয়া ভাদুড়ী, শাবানা আজমি, ওয়াহিদা রেহমান।
খাবার : ভাত, আলুপোস্ত, ইলিশমাছ ভাজা।
পানীয় : আইসক্রিম সোডা।
গায়ক : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কিশোরকুমার।
গায়িকা : লতা মুঙ্গেশকর, প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়।
চিত্রপরিচালক : গুরু দত্ত, সত্যজিৎ রায়।
খেলোয়াড় : সুনীল গাভাসকর।
শখ : ছবি দেখা।

– কীভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায় ?

দরকার ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট। দরকার প্রচুর কাজ।

– আপনি কি মনে করেন নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতা মাদকাসক্তির প্রভাব বাড়িয়েছে

উত্তর দেব না। প্রোফেশনের খাতিরেই উত্তর দিতে পারছি না।

কোন কোন নায়িকার সংগে আপনি অভিনয় করেছেন

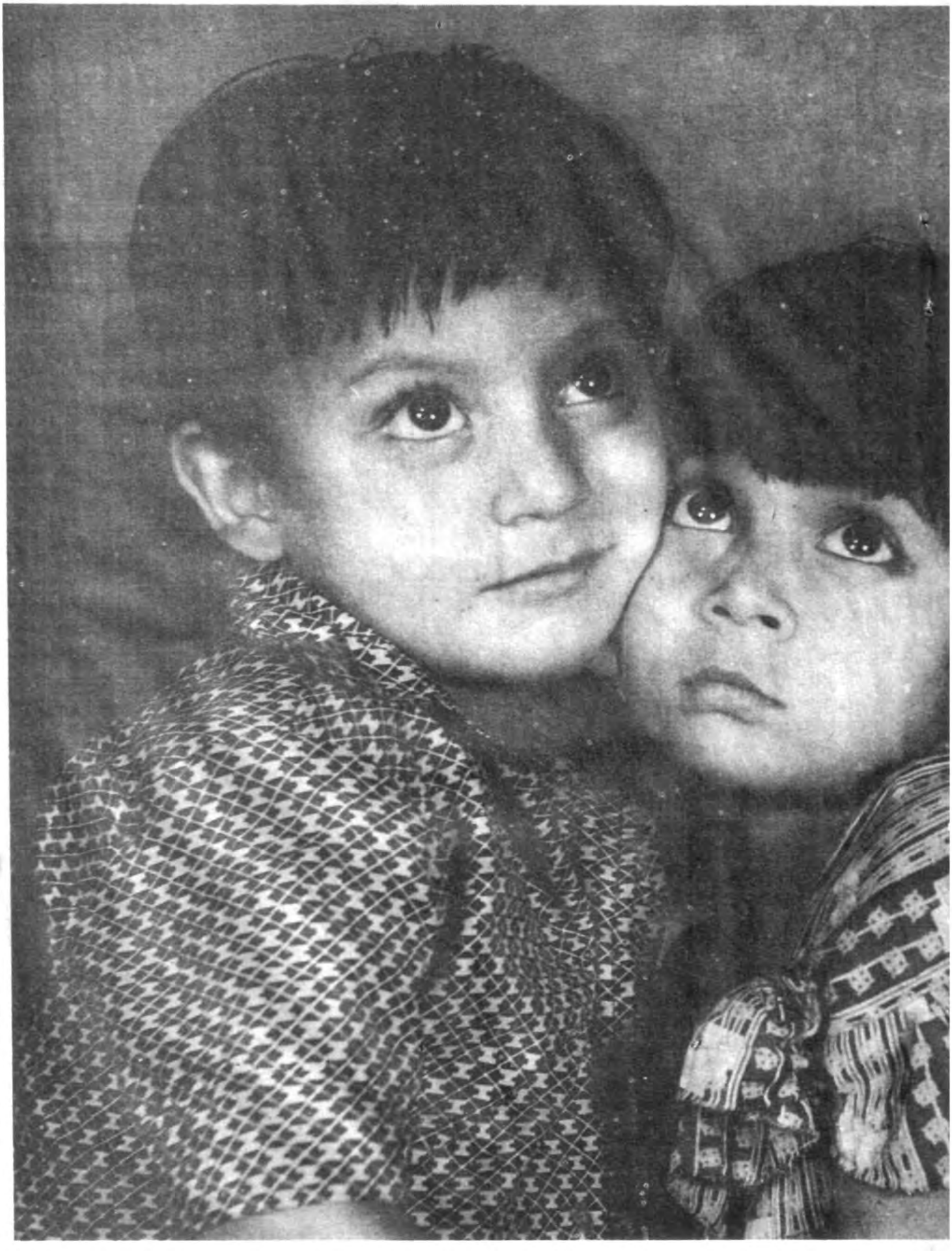
মুনমুন সেন, দেবশ্রী রায়, মহুয়া রায়চৌধুরী, শতাব্দী রায়, পাপিয়া অধিকারী, অনুরাধা (বোম্বে), রামেশ্বরী (বোম্বে), বিজয়েতা (বোম্বে) এছাড়া নতুন অনেক ছবিতে আরো দু একজন নায়িকার সংগে কনট্রাক্ট হয়েছে সেগুলো অচিরেই জানতে পারবেন।

শেষ প্রশ্ন : দেবশ্রী রায়ের সংগে আপনার প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে বাজারে দারুণ খবর চালু আছে। দু-একটা কাগজে এ নিয়ে লেখাও হয়েছে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি

– গুজব-গুজবই। সুতরাং গুজবই থাক।

সৈনিক রায়

ফটো : অংশু রায়





প্রচ্ছদ কাহিনী

ছেলে মেয়ে সমান সমান?

আমাদের সমাজে বাবা মা তার ছেলেটিকে আর মেয়েটিকে কি সমান করে দেখেন   না। বরং উল্টোটাই। পুত্র সন্তানেরই কদর বেশি। যদিও ইদানিং খুব ধীরে ধীরে দৃষ্টিভঙ্গির এই অসাম্য বদলে যাচ্ছে। সমীক্ষা নির্ভর এই লেখাটিতে সমাজের চিন্তার এই অসাম্যই বেরিয়ে এসেছে।

'হাম দো হামারা দো' ইদানিংকালের একটি বহুশ্রুত এবং জনপ্রিয় শ্লোগান। শ্লোগানটি অবশ্যই পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক। যার অর্থ স্বামী, স্ত্রী এবং দুটি সন্তান।   বিজ্ঞাপনের   দাপট যতই থাক না কেন সন্তানের সংখ্যা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দুই-এ থেমে নেই। এর একমাত্র কারণ অদম্য পুত্রাভিলাষ। বেশিরভাগই 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' সত্রে বিশ্বাসী। তাই অধিকাংশ পরিবারেই মেয়ের সংখ্যা ছেলের তুলনায় বেশি। পুত্র সন্তানের কামনায় একের পর এক সন্তান বাড়িয়ে যান বেশিরভাগ বাবা মা। কিন্তু কেন সন্তান ছেলে বা মেয়ে যাই হোক সে তো আদরেরই। অথচ আমাদের অবচেতনে তার অন্যথা ঘটে যায়।

নার্সিংহোম, হাসপাতালের লেবার রুমের বাইরে আত্মীয়দের উদ্বিগ্ন মুখ দেখা যায়। সেই সব চোখ মুখে থাকে ব্যাকুল প্রত্যাশা। ছেলে না মেয়ে, ছেলে, মেয়ে, ছেলে...   এই চিন্তা ঘুরপাক খায়। কিন্তু দেখা গেল দীর্ঘ গর্ভযন্ত্রণার পর মা জন্ম দিলেন একটি ফুটফুটে মেয়ের। অমনি ছায়া ঘনিয়ে এল বাইরে অপেক্ষামান আত্মীয়দের চোখে মুখে। নীরবে চলে গেলেন তারা কিন্তু ছেলে হলেই উল্টো ছবি। কয়েকজোড়া মুগ্ধ চোখ আর ঠোঁটের কোণায় দেখা যায় হাসির ঝিলিক। এবং বলাবাহুল্য, মিষ্টি বিতরণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটাই স্থিরচিত্র। ব্যতিক্রমও আছে।

যান্ত্রিকতার যুগে সময়ের মিছিলে মানুষ সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভীষণভাবে হিসেবি হয়ে উঠেছেন। এই হিসেবি হয়ে ওঠাটা বহুক্ষেত্রেই বেহিসেবি হয়ে ওঠে। তাই সংসারের হিসেব নিকেশও ওলোটপালট হয়ে যায়। যার জন্য অনেকপরিবারে দেখা যায় একটি ছেলে ও দুটি মেয়ে   পুত্রের জন্যই স্ত্রী। তাই, পুত্র সন্তানটি হবার পরই শুরু হয়ে যায় স্ত্রীকে নিয়ে ছুটোছুটি টিউবেকটমি (বন্ধ্যাত্বকরণ) অস্ত্রোপচারের জন্য। কিন্তু জীবন কখনো এই ধরনের বাঁধাধরা ছকে চলে না। তাই হয়ত কোন এক পথ দুর্ঘটনায় বাবা মার একমাত্র পুত্র সন্তানটি তাদের বুকের খাঁচা খালি করে পালিয়ে গেল। শোকগ্রস্ত পরিবারটিকে অনেকে সান্ত্বনা দিতে এলেন। তারই মধ্যে কয়েকজন মহিলার নিষ্ঠুর মন্তব্য ওনার তো ছেলে একটিই ছিল, এখন কি হবে

ভেবে দেখারই মতো, এখন কি হবে তবে সবাই কিন্তু এমন ছেলে ছেলে করে পাগল নয়। এঁদের মধ্যে ভবানীপুরের সুপ্রিয়া রায়ও রয়েছেন। সরাসরি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই বিষয়ে। সুপ্রিয়া জানালেন 'দেখুন সন্তান সন্তানই। ছেলে-মেয়ে দুজনই ভীষণ আদরের।' আপনার কটি সন্তান   'আমার এক ছেলে (৬ বছর) মেয়ে (৪ বছর)। দুজনই আমার কাছে

মতামত


ডেইজি সাহা


সুমিতা সাহা


বিনয় বিশ্বাস


দেবপ্রসাদ চৌধুরী

ডেইজি সাহা, প্রধান শিক্ষিকা, ৪২

আমার কাছে ছেলেকে অ্যাসেট হিসেবেই মনে হয়। সন্তান জন্মের সময় আমি ছেলের কামনাই করেছিলাম। বর্তমানে মেয়ের বিয়ে এবং পরবর্তী সময়ে তার শ্বশুরবাড়ি সংক্রান্ত সমস্যা যা কাগজে দেখি তা আমার কাছে কন্যা সন্তান জন্মানো সম্পর্কে ভীতি এনে দিয়েছে। যদিও এ ব্যাপারটা এখনও আমাদের হাতে নেই তবুও আমি পুত্র সন্তানই কামনা করি। বুড়ো বয়েসে ছেলে আমাকে দেখবে এ আশাটাও বোধহয় অন্যায় কিছু নয়।

বিনয় বিশ্বাস, চাকরিজীবী, ৩৯

আমি ছেলে বা মেয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখি না। সন্তান সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক অন্তত আমার কাছে সমান। পিতা হবার প্রাক্মুহূর্তে পুত্র সন্তানের জনক হবো না কন্যা সন্তানের জনক হবো এ নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যাথা ছিল না। আসলে সন্তান কীভাবে গড়ে উঠছে বা তার সুষ্ঠু বিকাশ কতখানি সম্ভব হচ্ছে সে দিকেই আমি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

সুমিতা সাহা, শিক্ষিকা, ৩০

ছেলে, মেয়ে কোনোটাতেই আমি কোনো প্রভেদ দেখি না। প্রাচীনরা ভাবেন ছেলে পরকালে মুখে জল দেবে বা বুড়ো বয়সে দেখবে। আমি তা ভাবি না। আজকাল প্রত্যেকেই তো পৃথক সংসার শুরু করেছে। আমার একটাই মেয়ে, তাই আমি ভাবছি 'আঙুর ফল টক'। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। আমার মনে হয় ঠিকমতো মানুষ করতে পারলে ছেলে বা মেয়ে উভয়ের কাছ থেকেই পরম তৃপ্তি পাওয়া যায়। তাদের জন্য গর্ব অনুভব করা যায়।

দেবপ্রসাদ চৌধুরী, ব্যবসায়ী, ২৮

আমার তো মনে হয় ছেলের বাবারাই বেশি সুখী। কেন না মেয়ে একটু বড় হয়ে উঠলেই তার ভবিষ্যৎ এবং নিরাপত্তার প্রশ্নটা এসে যায়। এই মাথা ব্যথাটা ছেলের বাবাদের অতটা থাকে না। তবে ছেলে না মেয়ে এতো আমরা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারি না, যদি পারতাম, সেক্ষেত্রে ছেলেই চাইতাম, তবে সন্তান স্নেহ ছেলে এবং মেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

সমান। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমার শ্বশুরবাড়িতে ছেলের সংখ্যা বেশি বলে আমার স্বামী কিন্তু ভীষণভাবে মেয়ে চাইতেন।

একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ অফিসারের স্ত্রী ইন্দ্রাণী বিশ্বাস। তিনি বললেন 'আমি সবসময়ই ছেলে চাইতাম। এবং একমাত্র ছেলে, এখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র'। আমার কেনর জবাবে ইন্দ্রাণীর উত্তর 'দেখুন মেয়েদের জীবন ইদানিংকালে বিভিন্ন কারণে ভীষণ কঠিন এবং দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। আমি যেভাবে বড় হয়েছি সেইভাবে এখন কোন মেয়ের নিজেকে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এছাড়া অন্য কোন কারণ নেই।

সদ্য বিবাহিতা লিলি চ্যাটার্জীর অভিমত 'আমার সে রকম কোন চাহিদা নেই। মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক, সন্তান আমার কাম্য।'

দুঃখজনক হলেও অপ্রিয় সত্যি ইদানিং বিভিন্ন ছল ছুতোয় ছেলেদের পক্ষেই রয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। যে মা ছেলের কামনায় মেয়ের জন্ম দেন, পরে তিনি হতাশায় ভেঙে পড়েন। অন্তসত্ত্বা থাকাকালীনই তিনি ছেলের নামকরণও করে রেখেছিলেন। কিন্তু তারা ভেবে দেখেন না অনাগত ভবিষ্যতের নবপ্রজন্মের দিকে। অবচেতনে সেই মার মন কিছুটা অবহেলায়ও ভরে যায়। অথচ প্রাচীনকালে না হলেও কয়েকবছর আগেও এইধরনের চিন্তা



বদ্ধমূল ছিল না। এখনো খুঁজলে দেখা যাবে অনেকের মধ্যে নেই। এঁদেরই একজন সীমন্তিনী দত্ত। ত্রিশ বছরের সুন্দরী এই মহিলা দুটি স্বাস্থ্যবতী মেয়ের মা। দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হবার পর ওর পরিবার ছেলের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন। কিন্তু সীমন্তিনীর স্বামী খুবই খোলামনের। তিনি ছেলে, মেয়ের বাছবিচার করেননি

দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে সীমন্তিনী কিছুটা চিন্তার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু মেয়ে জন্মাবার পর সেই চিন্তা কেটে যায়। তিনি জানতে পারলেন মেয়ে হয়েছে। ওজন ৯ পাউন্ড। নিজেই বললেন, 'ধরুন আমার প্রথম সন্তানটি যদি ছেলে হতো তবে দ্বিতীয়টিতো মেয়েই চাইতাম। সুতরাং ক্ষতি কী পরপর দুটি ছেলে হলেও তো আমি হতাশ হতে পারতাম। তাই নয় কি ? ওকে

হাসপাতালে যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁরাও বলেছিলেন 'ছেলে, মেয়ে কোন ব্যাপার নয়। আজকের দিনে সবাই সমান। ছেলেদের সংগে মেয়েদেরও ছুটন্ত সময়ের দুরন্ত প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে।'

একটি অবাঙালি পরিবারের গৃহবধূ মিনু সোমানিও একই অভিমত ব্যক্ত করলেন। দুই মেয়ের মা। জিজ্ঞেস করেছিলাম, পুত্র সন্তানের প্রতি আকর্ষণ আছে কিনা। তিনি জানালেন 'যা নেই তা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। যে দুজন (বয়েস ১১ ও ৬) মেয়ে আছে

মতামত



অনুপকুমার দাশ, ৩২

ক্ষোভে কেশেই বলছি, আমি ছেলে পছন্দ করি। যা দিনকাল পড়েছে। তাতে বয়েসকালের ভাবনাটা এখন থেকেই ভেবে রাখা ভাল। সে-দিক থেকে অনেকেই বোধ হয় ছেলের পক্ষেই রায় দেবেন। আর বংশ রক্ষারও তো একটা ব্যাপার আছে। তবে, মেয়ে হলেই গেল গেল রব তোলার কোন মানে হয় না। তেমন শিক্ষা পেলে তারাও ছেলের অনেক দায়িত্বই পালন করতে পারে। করেও। তবে নজির বড় কম।

আমি, আমার স্বামী তো বটেই পরিবারের অন্যান্যরাও তাঁদের পিছনে অনেক সময় দেন। এছাড়াআমিও তো এমন এক পরিবারে জন্মেছি যেখানে অধিকাংশই মেয়ে। আমরা চারবোন। ভাই নেই। তবুও আমার এবং দিনেশ (আমার স্বামী)-এর মনে হয় না কিছু হারিয়েছি বা কিছু পাবার আছে, থাকতে পারে।'

শুধু মেয়ে, শুধু ছেলে পেয়েও অনেকেই

মতামত



প্রদীপ ভট্টাচার্য



শ্রীমা ভট্টাচার্য



পবিত্র মুখোপাধ্যায়



মনোরমা বিশ্বাস

প্রদীপ ভট্টাচার্য, ৩৩

গত বছর বাবা হয়েছি। না, ছেলের নয়, মেয়ের। অবশ্যই কোন খেদ নেই। সত্যি বলতে কি, আমার স্ত্রী-ই বরং একটু আহত হয়েছিলেন। তবে এখন আমার মতই, সুখী। ছেলেরা বয়স কালে বাবা মাকে দেখবে, মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে - এটাই সমাজবিধি। কিন্তু আজকাল এই বিধির ব্যতিক্রম এতই আকছার যে ঐ বিধির বশে ছেলে হল না বলে মন খারাপের কোন অর্থই হয় না। ওটা একধরনের সংস্কার।

শ্রীমা ভট্টাচার্য, গৃহবধূ, ২৯

আমার একটিই সন্তান, ছেলে। আমি তো বলবো ছেলে হয়েছে বলে আমি বেঁচে গেছি। আমাদের মতো মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীদের সংসারে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে কী ব্যাপার তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। পণপ্রথার রকমফের তো চারদিকেই দেখছি। মেয়েকে অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে গড়ে পিঠে পরের হাতে তুলে দিয়েও কি নিষ্কৃতি আছে? আজও মেয়ের বাপ মাকে কেঁচোটি হয়ে থাকতে হয় তার শ্বশুর বাড়ির কাছে। আমি মেয়ে চাই না।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়, ৩৪

সন্তান মাত্রই আমার প্রিয়। ছেলে বা মেয়েতে কোন ফারাক করতে চাই না, করিও না। ব্যাপারটাই অরুচিকর। ছেলে বৃধ্ধ বয়সে বাবা-মাকে দেখবে আর মেয়ে বড় হলেই পরের বাড়িতে চলে যাবে - হিসাবে এই নিরিখে ছেলের পক্ষে ভোট দিতে অন্তত আমার মন সায় দেয় না।

মনোরমা বিশ্বাস,৩৪

ন'বছর হতে চলল বিয়ে হয়েছে। একমাত্র মেয়ের বয়স সাত বছর। ছেলের মা হতে পারিনি বলে দুঃখ নেই। ভবিষ্যতে, মানে বয়েসকালে ছেলের পয়সায় খাব এমন আশা কোনকালেই করিনি।
প্রমাণটা তো মানবিকতার। সেটা শিক্ষার ওপর নির্ভর করে। নয় কি?



সুখী নন। বাসন্তী কৃষ্ণান জানালেন সেই কথা। 'দেখুন আমার একটা মেয়ে রয়েছে। আমি আর আমার স্বামী এতে ভীষণ নি:সঙ্গ বোধ করি। যদি একটা ছেলে হয় ক্ষতি কি তবে এবিষয়ে আরেকটা কথাও বলতে পারি। দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে হলেও অল-রাইট।

অনেক যুক্তি, তক্কো গপ্পোর অবতারণা করে কিন্তু ইদানিংকালের মানুষদের প্রাচীন ধ্যানধারণা থেকে ফেরানো যায় না, সম্ভব নয়ও। কবির কাব্যে, লেখকের গল্পে, শিল্পীর তুলিতে অনেক বীরাঙ্গনার ছবি এই মুহূর্তেও কিন্তু উজ্জ্বল। তবুও মন যেতে চায় সেই অচিনপুরে। যেখানে ঘুরে মরছে পুরাণের সেই শ্লোকটি 'অষ্টা পুত্র ভব অর্থাৎ আপনার আট ছেলে



হোক।' এই আট ছেলের ধ্যান-ধারণা নিয়েই তো রয়েছেন। কিন্তু কেন মেয়েদের বিষয় অনেক আইনকানুনের কথা শাস্ত্রছাড়াও অন্যত্র অনেকেই বলেছেন। কিন্তু কেউ বলেননি মেয়েরা যেন ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের মতো ব্যবহৃত না হয়। এবং শুধুমাত্র পুত্র সন্তানের জননীই না হয়। হয়ত বা এই কারণেই কম্পিউটারের যুগে গর্ভাবস্থাতেই ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে আধুনিকাদের ভিড়। ভিড় হাল্কা হলেতো সুখের কথা। না হলে পুরনো ধ্যান ধারণা নিয়েই বাঁচতে হবে। যেখানে থাকবে কল্পনার দূরত্ব বাস্তবের স্পর্শ নয়।

পর্ণা পাল

সাক্ষাৎকার: আশিস ভট্টাচার্য

মতামত



তুলসী দাস



সংগীতা নন্দী



সুপ্রীতি বাগচী



সৌমেন ভট্টাচার্য

তুলসী দাস। বয়স ২৪

আমার মেয়ে । বিয়ের ৩/৪ বছর পরে হয়েছে, খুবই আদরের। তবে একটা ছেলের আকাঙ্ক্ষা সব মায়েরই থাকে। বুড়ো বয়সে একটা ছেলে থাকলে অনেক বল-ভরসা। তাছাড়া, আমাদের মত গরীবের ঘরে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে সেইভাবে মানুষ করার সুযোগ আর কতটুকু। বিয়ের চিন্তা করতেই হয়। আর সেটা ভাবলেই তো গায়ে জ্বর আসে।

সংগীতা নন্দী। বয়স ৩০

আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে না হয়ে দুই মেয়ে হলেও আমার কোনো আক্ষেপ থাকত না। কারণ, ছেলে আর মেয়েকে একইভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনে দাঁড় করাতে চাই। যুগের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি পালটানো দরকার। এখনও যদি ভাবি, মেয়ে মানেই - পাত্র খোঁজা, পণের টাকা জমানো আর পরের ঘরে পাঠানোর প্রস্তুতি, সেটা খুবই ভুল।

সুপ্রীতি বাগচী, গৃহবধূ, ২৫

বর্তমানে ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় যেভাবে নির্বিচারে কন্যা ভ্রূণ হত্যা হচ্ছে তাতে জনমানসের প্রতিফলন বুঝতে সময় লাগে না। শিক্ষিত পরিবারে এখন সন্তান সংখ্যা সীমিত তার মধ্যে ছেলে বা মেয়ে বাছা উচিত নয়। সন্তান সব সময়েই বাঞ্ছিত। আমার তো মনে হয় প্রকৃতির দানে সন্তুষ্ট না থেকে খোদার ওপর খোদগারী করা নির্বুদ্ধিতা।

সৌমেন ভট্টাচার্য। বয়স ৩৫

বিয়ে করেছি। এখনও ছেলেমেয়ে হয়নি। তবে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, আমার কাছে সমান। মেয়ে হলে এমনভাবে মানুষ করব যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। সে সুযোগ তো এখন আছেই। বিয়ের ব্যাপার ছেড়ে দেব মেয়ের পছন্দের ওপর। পাত্রস্থ করার চিন্তা মাথায় না রাখলে এ যুগে আর ছেলেমেয়ের তফাত কোথায়!





পাকিস্তানে মহিলা- রাজনীতিকের সংখ্যা বাড়ছে না

ভয়াবহ রক্ষণশীলতার জটিল বাধাই পাক-মহিলাদের রাজনৈতিক অংগনে অবাধ প্রবেশের বড় অন্তরায়। স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে মাত্র চার জন মহিলা জাতীয় রাজনীতির সভা-মঞ্চ আলোকিত করেছেন। মোট জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মহিলা হওয়া সত্বেও পাকিস্তানে মহিলা রাজনীতিকের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে নগণ্য। পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। তাতে শাসকদলের তরফে মনোনীতও হন অনেকেই। তবুও রাজনীতিক হিসেবে মহিলাদের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মত।

আজাদী-উত্তর পাকিস্তানে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন জাতির জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর ভগ্নী কুমারী ফাতেমা জিন্নাহ। লৌহ-মানব আয়ুব খানের শাসনকালে শাসকদলের বিরুদ্ধে সকল বিরোধী দলকে জোটবদ্ধ করেছিলেন তিনি। একটা সময় ছিল যখন আয়ুব খানের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করা মানেই 'দেশদ্রোহী' হওয়া। আয়ুব খানের সামরিক শাসনের নিষ্পেষণে জনগণ যখন বাক-শক্তিরহিত, তখন বিদ্রোহের জলন্ত মশালে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটান ফাতেমা জিন্নাহ। জাতির জনক মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর ভগ্নী হিসেবে ফাতেমা ছিলেন জনগণের বিশেষ পরিচিতা এবং সম্মানিতা। জিন্নাহ পরিবারের মেয়ে হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তাও ছিল আকাশচুম্বী। আয়ুব খানের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ফাতেমা যখন দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করেন, তখন তাঁকে সমর্থন জানান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল বিরোধী দল। আয়ুবের উপদেষ্টারা ফাতেমাকে গ্রেপ্তারের পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু আয়ুব খান তা করার সাহস পাননি।

১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্সি নির্বাচনে আয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়ান ফাতেমা জিন্নাহ। নির্বাচনী প্রচারে ফাতেমা আয়ুব খানকে ছাড়িয়ে

গিয়েছিলেন। গোটা পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রেসিডেন্ট আয়ুব বিশিষ্ট ধর্মগুরুদের দিয়ে এই প্রচার চালালেন, মুসলিম সমাজে রাষ্ট্রের প্রধান একজন মহিলা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

মৌলবাদের এই প্রচারে ফাতেমা অসুবিধায় পড়লেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন অবিবাহিতা। তাঁর এই কুমারী জীবন নিয়েও রচিত হল নানা কুৎসা। সর্বোপরি ফৌজি ফরমান উচ্চারিত হল প্রশাসনের সর্বস্তরে, আয়ুবকে জেতাতেই হবে।

ভোট হল এবং ফাতেমা জিন্নাহ হেরে গেলেন। তিনি হেরে গেলেও জয় হল পাকিস্তানের আপামর জনগণের। কেন না ফাতেমা ঘুমিয়ে পড়া জনগণকে নির্বাচনী প্রচারের সময় যেভাবে উদ্দীপিত করেছেন, জাগিয়ে তুলেছেন তার ইতিবাচক উদ্দাম প্রত্যক্ষ হয়েছে ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলনে, আয়ুবের পতনের ঘটনায়।

নির্বাচনের প্রচণ্ড ধকলে প্রৌঢ়া ফাতেমার শরীর ভেঙে পড়েছিল। অসুস্থ হয়ে তিনি শয্যা নিলেন। আর ফিরে এলেন না রাজনীতিতে। ১৯৬৮-তে মারা গেলেন তিনি।

১৯৭৭-এ জুলফিকার আলি ভুট্টোর ফাঁসিতে মৃত্যুর পর পাকিস্তান পিপলস পার্টির হাল ধরেন তাঁর বিধবা পত্নী বেগম নসরত ভুট্টো। পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন পিপলস পার্টির দলনেত্রী হিসেবে বেগম নসরত অল্প সময়ের মধ্যেই সারা বিশ্বে আলোড়ন তোলেন। দলকে দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দেবার আগেই তাঁকে সরে দাঁড়াতে হয় শারীরিক অসুস্থতার কারণে।

এরপর দলের নেত্রী হিসেবে বিশেষ সাড়া জাগিয়ে আবির্ভূতা হন ভুট্টো-তনয়া বেনজির ভুট্টো। বিশ্বে যে কজন মহিলা রাজনীতিক স্বল্প সময়ের মধ্যে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন বেনজির নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল নারী চরিত্র বর্জিত নাটকের নিষ্প্রাণ মহড়া। সুদর্শনা, সুবক্তা, দীর্ঘাঙ্গী বেনজিরের আবির্ভাবে পাক-রাজনীতির ঝিমুনি ভাবটা কেটে গেল খুব সহজেই। উত্তাল জনসমর্থনের



পরী গুল

অভাবনীয় নজির গড়ে বেনজির দেখিয়ে দিলেন তিনি তাঁর প্রয়াত পিতার মতই সমান জনপ্রিয়। শুধু তাই নয়, জেনারেল জিয়াউল হকের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি যথার্থই প্রমাণ করেছেন, পাকিস্তানের একমাত্র জনপ্রিয় জননেত্রী তিনিই।

পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের মধ্যে নারী শিক্ষায় সবার আগে রয়েছে পাঞ্জাব। তারপরেই সিন্ধুর স্থান। অন্যদিকে বালুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে নারী শিক্ষার প্রসার খুবই কম। সেখানকার মহিলারা রাজনীতিতে আসার কথা কখনই ভাবেন না।

বিজ্ঞান ও প্রগতির এই যুগে এই দুটি প্রদেশের মেয়েরা স্থায়ী অন্ধকারে ডুবে থাকুক এটা প্রত্যাশিত হতে পারে না। তাই বালুচিস্তানের মেয়ে পরী গুল নিজেই প্রথা ভেঙে এসেছেন উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনে। বাড়ির সকলের শত বাধা উপেক্ষা করে নারী-শিক্ষার জোরদার আন্দোলন গড়ে একসময় ঢুকে পড়েছেন পুরুষ শাসিত রাজনীতির আম দরবারে। এগিয়ে যাবার দুর্বার ক্ষমতায় আজ তিনি শুধু বালুচিস্তান বা সীমান্ত প্রদেশ নয়, গোটা পাকিস্তানেই অন্যতম জনপ্রিয় মহিলা রাজনীতিক। বালুচিস্তান প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী।

পরী গুলের জন্ম রক্ষণশীল বালুচ পরিবারে। ছেলেবেলা থেকেই সমাজ সেবার প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড ঝোঁক। স্কুলে পড়তে পড়তেই তিনি অনুভব করেছিলেন, বালুচ মেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা দরকার। উপযুক্ত শিক্ষা না পেলে, মেয়েদের সত্যিকার উন্নতি সম্ভব নয়। সম্ভব নয় পুরুষ শাসিত সমাজে সম্ভ্রম ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা। সংসারে প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কুমারী পরী গুল বালুচিস্তানের নারীমুক্তি আন্দোলনে বরাবর সামনের সারিতেই থেকেছেন। বোলান অঞ্চলের অশিক্ষিত ও দরিদ্র মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য গড়ে তুলেছেন বোলান মহিলা সংঘ।

কোয়েটায় কলেজে পড়াকালেই গোটা বালুচিস্তানে পরী গুলের নাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। গোঁড়া মুসলিম পরিবারের মেয়ে পরী নারী স্বাধীনতা ও নারী শিক্ষার জন্য যে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, তা কোন সংবাদ মাধ্যমেরই চোখ এড়ায়নি।

বালুচিস্তানের গভর্নর পরী গুলের নারী আন্দোলনের কর্মসূচী দেখে খুশি হন। বোলান মহিলা সংঘ যাতে সরকারি আর্থিক সাহায্য পায় তিনি সে ব্যবস্থাও করে দেন।

বালুচিস্তানের অধিকাংশ গ্রামেই কোন স্কুল ছিল না। পরী গুল নিজে উদ্যোগী হয়ে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করেন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হবার পর নারী শিক্ষার প্রসারে তিনি জোরদার তৎপরতা শুরু করেছেন।

বালুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী মীর গোলাম কাদির শিক্ষামন্ত্রী পরীকে যথেষ্ট খাতির করেন। এই খাতিরকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাখাতে বার্ষিক বরাদ্দ প্রতি বছর বাড়িয়ে নিচ্ছেন। গত আর্থিক বছরে বালুচিস্তানে শিক্ষাখাতে ৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বালুচিস্তানের এই মহিলা রাজনীতিক আগামীতে জাতীয় রাজনীতির প্রশস্ত অঙ্গন আলোকিত করবেন কিনা, তা এখনি বলা মুশকিল। তবে শাসক মুসলিম লিগ বেনজির ভুট্টোর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী পরী গুলকে ইসলামাবাদে নিয়ে যেতে পারে। □

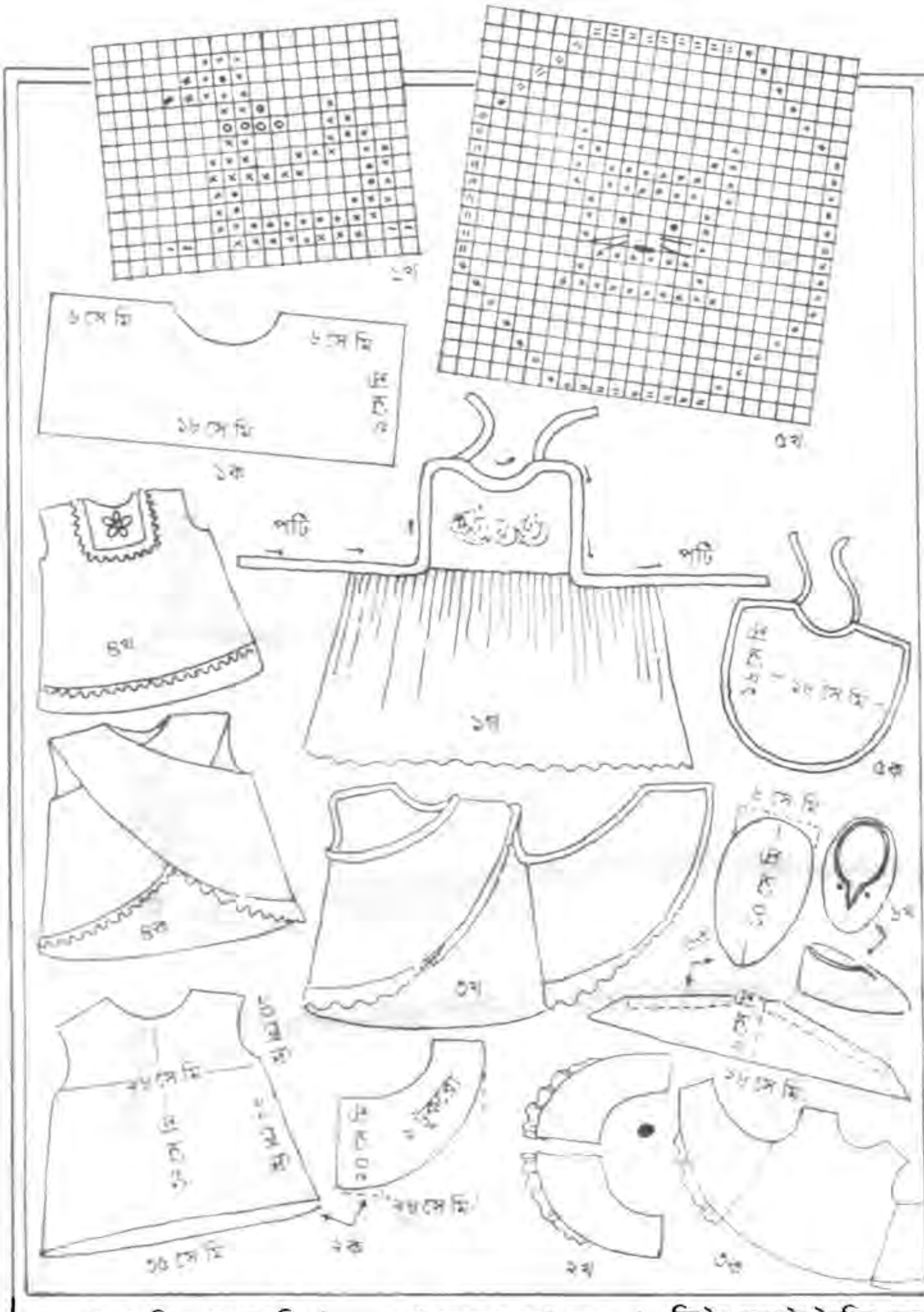
মিহির কর্মকার



সেলাই

পুতুলের জামা

গরম পড়তেই মেয়ের বায়না; 'আমার মত পুপুদেরও এবার জামা বানিয়ে দাও'। পুপু মানে ওর পুতুল। গরমের শুরুতে ওর জন্য গোটা কয়েক ফ্রক করেছি, এবার ওর পুতুলদেরও করে দিতে হবে। যুক্তি হল, 'ওদের বুঝি গরম লাগে না ?' একেবারে নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত তৈরি করতেই হল পুতুলদের দুটো জামা। একটা একরঙা নীল কাপড়ে, অন্যটা কালো ছিটের কাপড়ে।



৯০ সে মি × ২৪ সে মি মাপে নীল কাপড়টা কেটে লম্বা বরাবর একদিক হেম সেলাই করে মুড়ে নিলাম। অন্য প্রান্ত কোমরের ঘেরের জন্য কুঁচিয়ে নিলাম। এক টুকরো নীল সেলুলা কাপড় (যে কাপড়ে সহজে ঘর গুনে ক্রুশ স্টিচ করা যায়) বাড়িতেই ছিল। সেটা থেকে ১ক ছবির মাপ অনুযায়ী কেটে নিলাম। তারপর রঙিন সুতোয় ক্রুশ স্টিচে ১খ ছবির গ্রাফটি তাতে সেলাই করলাম। সেলাইয়ের পর সেলুলা কাপড়ের পেছনে সেই মাপের একটা সাদা লনের টুকরো বসিয়ে দিলাম। তারপর ১গ ছবি অনুযায়ী সেলুলা কাপড় ও নীল কাপড়ের কুঁচোনো দিকটা জুড়ে নিলাম। এবার নীল কাপড় থেকে একটা সরু লম্বা ফালি কেটে পটি মুড়ে এমনভাবে কোমরে বসালাম, যাতে ফিতে বা বেল্টের মত ব্যবহার করা যায়। তারপর নীল কাপড়ের দুটি সরু স্ট্র্যাপ তৈরি করে গলার দুপাশে লাগিয়ে দিলাম। তৈরি হয়ে গেল একটা জামা।

ছিটের জামাটা তৈরির জন্য ২ক ছবির মাপ অনুযায়ী তিনটে টুকরো কাটলাম। ৪০ সে মি × ৪ সে মি কাপড় কেটে একদিকে ১ সে মি মুড়ে নিয়ে অন্যদিকে কুঁচি করলাম। তারপর ২খ ছবির মত জুড়ে দিলাম। ৩ক ছবিতে যেভাবে তিন টুকরো কাপড় জোড়া হয়েছে, এরপর সেইভাবে জুড়লাম। এবার একদিকের কাঁধ সেলাই করে বাকি অংশের চারধার পটি মুড়ে নিলাম (৩খ ছবি)। জামার পেছনদিকটা ৪ক ছবির মত দেখতে হল। সামনের দিকটা কেমন সাদামাটা লাগছিল। ঘরে ছিল এক টুকরো লেস, বসিয়ে দিলাম বুকের দিকে (৪খ ছবি)। লেস না থাকলে দুটো বাহারি বোতাম বসিয়েও কাজটা করে নেওয়া যেত। যে কাঁধটা খোলা রইল, তাতে দুটো টিপ বোতাম বসিয়ে দিলাম।

সেলুলা কাপড় আর একরঙা নীল কাপড় কিছুটা বাঁচল। সেটুকু দিয়ে পুতুলের জন্য এক জোড়া জুতো আর একটা বিব তৈরি করে করলাম। ৫ক মাপে সেলুলা কাপড় কেটে চারপাশে নীল কাপড়ের পটি দিয়ে দিলাম। গলার দুপাশে বসালাম নীল কাপড়ের স্ট্র্যাপ। তারপর ৫খ ছবির গ্র্যাফটা সেলাই করলাম বিব-এর মাঝখানে। তৈরি হয়ে গেল বিব। এবার জুতোর জন্য ৬ক ছবির মাপে সেলুলা ও নীল কাপড় থেকে এক জোড়া টুকরো কাটলাম। নীল কাপড়ের চওড়া দিকটা পায়ের সামনের দিক ধরে তার মাঝখান থেকে সেলুলা কাপড় নীল কাপড়ের ধার বরাবর জুড়ে দিলাম। তারপর ৬ক ছবির চিহ্নিত অংশের মত কাপড়ের ওই অংশটি ভেতর দিকে মুড়লাম। বাকি অংশ জুড়ে দিলাম (৬খ ছবি)। জুতোর সামনের দিকে দুটো বোতাম বসিয়ে ধারের দিকটায় ক্রুশ স্টিচে হালকা একটু কাজ করে নিলাম। দেখতে সত্যিই খুব বাহারি হল। মেয়ে তো আহ্লাদে আটখানা। আর মজার কথা কি জানেন, কদিন পরেই জামা-জুতো বিব এর ঠিক একরকম আরেকটি সেট তৈরি করে বন্ধুর সদ্যোজাত কন্যাকে উপহার দিলাম। এই উপহারে সকলের দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছিলাম।

সঞ্চিতা রায়


নেস্টাম বেবি সিরিয়্যাল। আদর্শ, শুরু করার জন্য। বেড়ে ওঠার পক্ষে অনন্য।
নেস্টাম আর দুধ—পুষ্টির দিক থেকে এক পরিপূর্ণ খাবার।
আপনার বাচ্চার চার মাস বয়েস হলেই দুধের সংগে সংগে তার শক্ত খাবারেরও দরকার। নেস্টাম বেবি সিরিয়্যাল দিয়ে ওকে শক্ত খাবার ধরান—শিশুদের সহজে হজম করার উপযোগী করে বিশেষভাবে এটি তৈরী।
আগে থেকে ফোটানো কুসুম কুসুম দুধে নেস্টাম শুধু মিশিয়ে নিন। সংগে সংগেই পুষ্টিকারক খাবার তৈরী। শিশুকে মোটাসোটা আর প্রাণোচ্ছল করে তুলতে সাহায্য করে।
টিনের গায়ে লেখা নিয়মাবলী ঠিকমত মেনে চলুন।
নেস্টাম ও আপনার প্রস্তুত প্রণালী—শিশুর খাবারে অসংখ্য রকমারিত্ব।
আপনার বাচ্চা যেমন যেমন বড় হবে তেমনি আপনিও তাকে নানারকম স্বাদের খাবার তৈরী করে দিতে পারেন। নেস্টামের সংগে চটকানো সব্জী, সেদ্ধ করা ফল ও ডাল মিশিয়ে নতুন নতুন স্বাদের খাবার ওকে দিন। এমনি করেই ও বাড়ির সবার সংগে মিলে নানারকম খাবার খেতে শিখবে।
নেস্টাম®
রাইস
আয়রণ ও ভিটামিনে ভরপুর দুধে মিশিয়ে নিন
এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন প্যাকে
Nestlé
Nestum
baby cereal
Rice
mix with milk
বিনামূল্যে।
খাবারে রকমারী স্বাদ আপনার বাচ্চাকে খুশি করবে। সুতরাং বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি পুস্তিকার জন্যে নীচের ঠিকানায় লিখুন:
নেস্টাম পোস্ট বক্স নং ৬০১৬, নিউ দিল্লী ১১০০০৮
Nestlé
FSL.N/3800BN

সেলাই

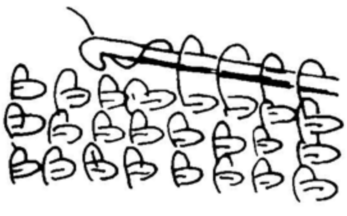
টিউনিশিয়ান স্টিচের সাইড ব্যাগ



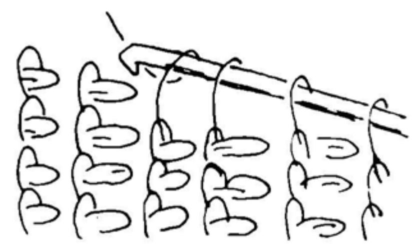
নানা ধরনের সাইড ব্যাগ ব্যবহার করতে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হবে এই ব্যাগটি। ব্যাগটির দু'পিঠ দু'রকম করা হয়েছে বৈচিত্র্য আনার জন্য। ইচ্ছে হলে দু'পিঠ একইরকম করা যেতে পারে।

সাধারণত কুরুশে যে স্টিচ ব্যবহার করা হয়, সেই স্টিচেই তৈরি টিউনিশিয়ান। তবে স্টিচের পদ্ধতি কিছুটা

ছবি : [illegible]



ঘর তোলা



ঘর বন্ধ করা

অন্যরকম। আর কুরুশটিও দেখতে বোনার কাঁটার মত লম্বা এবং শেষে একটি গাঁট থাকে। বোনা হয় দুই সারিতে। প্রথম কাঁটায় ডান দিক থেকে ঘর কাঁটায় তুলতে তুলতে বাঁ দিকে যেতে হয়। দ্বিতীয় কাঁটায় ঘর বন্ধ করতে করতে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে আসতে হয়। কখনই বোনাটি ঘুরিয়ে নেওয়া হয় না। অর্থাৎ সোজা দিকেই বোনা হয়। বোনার শেষে হাফ লঙ্ বুনে শেষ করতে হয়।

দু ধরনের ডিজাইন ব্যবহার করে ব্যাগটি বোনা হয়েছে। (১) সরল টিউনিশিয়ান (২) তরঙ্গ বা ঢেউ খেলানো টিউনিশিয়ান।

সরল টিউনিশিয়ান

যতটা চওড়া করতে চান, সেই মাপে চেন বুনুন

১ম কাঁটা ২য় চেন-এ কুরুশ ঢুকিয়ে সুতো টেনে ঘর কুরুশে রাখুন। এভাবে পরের চেন-এ কুরুশ ঢুকিয়ে সুতো টেনে ঘর বাড়িয়ে যান।

২য় কাঁটা – কুরুশে সুতো জড়িয়ে ১টি চেন তৈরি করে ১ম ঘরটি বেঁধে দিন। এবার কুরুশে সুতো জড়িয়ে ১ম ও ২য় ঘরের মধ্যে দিয়ে সুতো টানুন। আবার সুতো জড়িয়ে ২য় ও ৩য় ঘরের মধ্যে দিয়ে সুতো টানুন। এভাবে ৩য় ও ৪র্থ ঘর, ৪র্থ ও ৫ম ঘর বুনে যান। শেষে ১টি চেন বুনুন। ১টি চেন কুরুশে থাকবে। সুতরাং ১ম ঘর বাদ দিয়ে ২য় ঘরে বুনুন।

তরঙ্গ

এটি দুই বা তার বেশি রঙে বোনা হয়। এখানে বাদামি ও সবুজ রঙে বোনা হয়েছে। প্রথমে ২ সারি 'সরল টিউনিশিয়ান' বোনার জন্য ১০ ঘর হিসেবে বাদামি সিল্ক ক্রুচের সুতোয় ঘর তুলে সরল টিউনিশিয়ান বোনা হয়েছে। আপনি আপনার পছন্দসই যে-কোনো রঙ ব্যবহার করতে পারেন।

১ম কাঁটা – * সবুজ সুতোয় ২ঘর না বুনে কুরুশে তুলে নিন। ২ ঘর বুনুন। ৪ ঘর হাফ লঙ্ বুনুন। আবার ২ ঘর বুনুন।* তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি হবে।

২য় কাঁটা সবুজ রঙে সরল টিউনিশিয়ান বুনুন।

৩য় ও ৪র্থ কাঁটা – বাদামি রঙে সরল টিউনিশিয়ান বুনুন।

৫ম কাঁটা সবুজ রঙে * ৩ হাফ লঙ্ বুনুন। ২ ঘর বোনা, ২ ঘর তোলা। ২ ঘর বোনা, ১ হাফ লঙ্ বুনুন।* তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি হবে।

৬ষ্ঠ কাঁটা সবুজ রঙে সরল টিউনিশিয়ান বুনুন।

৭ম ও ৮ম কাঁটা বাদামি রঙে সরল টিউনিশিয়ান বুনুন।

ব্যাগের মাপ

লম্বা – ১৫ ইঞ্চি। চওড়া ১৩ ইঞ্চি।

কী কী প্রয়োজন

সবুজ রঙের সিল্ক ক্রচেট-বল – ২টি (প্রতিটি ৫০ গ্রাম), বাদামি সিল্ক ক্রচেট বল ১টি (৫০ গ্রাম), লাল সিল্ক ক্রচেট বল ১টি (১০ গ্রাম), খয়েরি সিল্ক সুতো ১ লাছি। কুরুশ ৯নং টিউনিশিয়ান কুরুশ (পলিথিনের কুরুশ নিউমার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়। বাড়িতে পুরনো হাড়ের কুরুশ থাকলে তার পেছনে কর্ক এঁটেও বুনতে পারেন)।

কীভাবে বুনবেন

নকশার যেদিকে ক্রস স্টিচের নকশা করা হয়েছে, সেদিকের পদ্ধতি প্রথমে জানানো হচ্ছে।

বাদামি সুতোয় ৬৪টি চেন বুনুন ১ম চেনটি বাদ দিয়ে ২য় চেন এ কুরুশ ঢুকিয়ে সুতো জড়িয়ে সেটি টেনে ঘর তৈরি করুন এবং কুরুশে রাখুন। মোট ৬৩ ঘর হবে। এই ঘরগুলো 'সরল টিউনিশিয়ান' বুনে ১৫ ইঞ্চি লম্বা করুন। শেষে এক সারি হাফ লঙ্ বুনে বোনাটি সুদৃশ্য করুন। এরপর নকশার ডাল ও পাতা সবুজ রঙে, ফুল লাল রঙে, কুঁড়ি ও ফুলের ভেতর খয়েরি রঙে ক্রস স্টিচ দিয়ে সেলাই করুন।

এবার ব্যাগের অন্য পিঠ। 'সরল টিউনিশিয়ান' ও 'তরঙ্গ' ডিজাইনের মিশ্রণে এই পিঠ বোনা হয়েছে।

প্রথমে ৬৪টি চেন বাদামি রঙে বুনুন। ১ম চেন বাদ দিয়ে ২য় চেন-এ কুরুশ ঢুকিয়ে সুতো টেনে ঘর তৈরি করে কুরুশে রাখুন। এবার যেভাবে রঙের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সেইভাবে রঙ মিলিয়ে 'সরল টিউনিশিয়ান' বুনুন।

১ম ও ২য় কাঁটা – বাদামি। ৩য় ও ৪র্থ বাদামি। ৫ম ও ৬ষ্ঠ – সবুজ। ৭ম – সবুজ রঙে ঘর তুলে যান ৮ম – লাল রঙে ঘর বন্ধ করুন। ৯ম ও ১০ম – সবুজ। ১১শ লাল। ১২শ বাদামি। ১৩শ – বাদামি। ১৪শ – লাল। ১৫শ – সবুজ। ১৬শ – বাদামি। ১৭শ – লাল। ১৮শ সবুজ। ১৯শ সবুজ। ২০শ – বাদামি। ২১শ – বাদামি। ২২শ – লাল। ২৩শ – লাল। ২৪শ – বাদামি। ২৫শ ও ২৬শ সবুজ। ২৭শ – সবুজ। ২৮শ লাল। ২৯শ ও ৩০শ – সবুজ। ৩১শ ও ৩২শ – বাদামি। ৩৩শ ও ৩৪শ – বাদামি।

৩৫শ ও ৩৬শ সবুজ রঙে তরঙ্গ বুনুন।

৩৭শ ও ৩৮শ – বাদামি রঙে সরল টিউনিশিয়ান।

৩৯শ ও ৪০শ সবুজ রঙে তরঙ্গ।

৪১শ ও ৪২শ – বাদামি রঙে সরল টিউনিশিয়ান।

৪৩শ ৪৪শ বাদামি রঙে সরল টিউনিশিয়ান।

পুনরায় ১ম কাঁটা থেকে বুনুন। কিন্তু ৩৫শ ও ৩৬শ এবং ৩৯শ ও ৪০শ তরঙ্গ নকশা ব্যাগের মাঝামাঝি জায়গায় আরও একবার বুনুন। এতে ব্যাগটি দেখতে সুন্দর হবে। মোট তিন ধাপ তরঙ্গ নকশা বোনা হবে। এভাবে ১৫ ইঞ্চি বোনার পর শেষে হাফ লঙ্ করে বোনাটিকে সুদৃশ্য ও মজবুত করুন।

ভারতী চক্রবর্তী

গল্প

সূর্যাস্তের জলদস্যু এবং পুতুলের মা



সুব্রত রাহা

জানলার মেঘলা কাচে পাখির ঠোঁট না কোনো মেয়েলি আঙুলের টোকা বোঝা গেল না। এই বিকেল এখন অসম্ভব করোজ্জ্বল বাগানের ভেতর রোদের নিঝুম সবুজঘ্রাণ। ফোয়ারার চাতালে কয়েকটা শালিখ এসে এইমাত্র বসল কোথাও কোনো শব্দ নেই। এখনই হয়তো শালিখগুলো কিচিরমিচির করে উড়ে যাবে। সারী শুয়ে আছে জানলার মেঘলা কাচে কে টোকা দিল পাখির ঠোঁট কিংবা

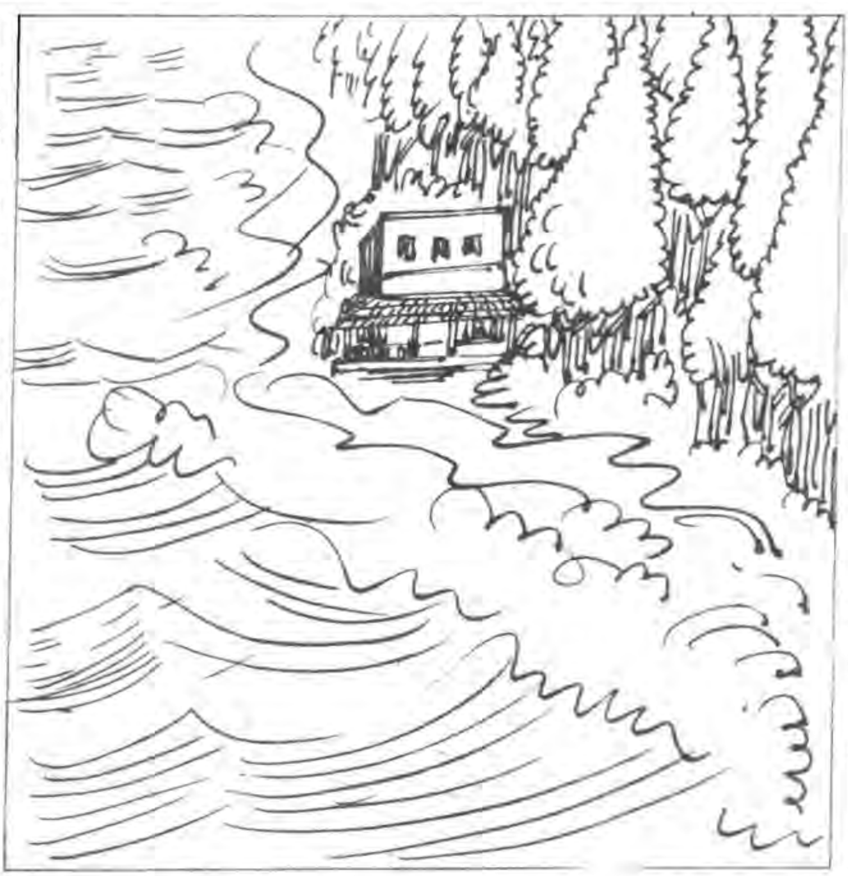
মামণির সেতার বাজানো সুন্দর আঙুল। বারান্দায় সুখচাঁদের মা বসে মালা জপছে। পাখি এসে কাচে ঠোকর দিলে হয়তো সে দেখবে না, কিন্তু মামণি এলে নিশ্চয় একঠায় বসে মালা জপতে পারবে না। মামণি মালা জপাটপা একদম পছন্দ করে না। এইসব ভাবতে ভাবতে সারী পাশ ফিরে শুল। দেওয়ালে একটা বন্য ছবি।

ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সারী। বিদেশী কোনো শিল্পীর আঁকা। ছবিটা আজ অনেক দিন ধরে তার শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে। মনে হচ্ছে সেদিন ঠিক এমন একটা রঙ ঘরের ভেতর পর্দায় ঝুলছিল। ছবিটার ঝোপজঙ্গলে এমন রোদ-রঙ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের ভাঁজে ভাঁজে যেন কামনার উষ্ণতা আর সোনালি বিষণ্ণতা। ঠিক সেদিনের মতই। একটা জল পায়রার শরীর। নরম মাংসের গভীরে হিংস্র শ্বাপদের স্বাদগ্রহণ। ছিন্ন ছিন্ন দৃশ্যের অ্যালবাম যেন বুকের গভীরে লুকানো আছে ডাক্তার বলে ওইটা ভুলে যেতে হবে। মামণি বলে, 'টেক ইট ইজি, এটা তোমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স। কিন্তু ব্যাডলাক এটা এভাবে ঘটে গেল।' বাপি শুধু বলেছে, 'মনের দিক থেকে এখনও তুমি ভার্জিন সারী

সারীর ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগে।

রাতে খাবার টেবিলে মাঝে মাঝে বাপি আর মামণির দেখা হয়। বাপি তো মাসের অর্ধেক দিন বিজনেস এর কাজে বাইরে থাকে। মামণি তার পার্টি, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার আর উই-লিভ মুভমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত। সারী সারা দিন প্রায় একা। সুখচাঁদের মা ঝিনঝিন কণ্ঠে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে। কখনও সে মালা জপে। তবুও সুখচাঁদের মা-ই তাকে চোখে চোখে রাখে। গল্প বলে অশোকবনে সীতা-মাঈ-র দুঃখের। রাবণ কতভাবে মন ভোলাতে চায় কিন্তু সীতার দেহ আর মনকে জয় করতে পারে না। সারী ভাবতে চেষ্টা করে অশোককানন কেমন ছিল। সী-বীচের ঝাউবাংলোর মত ছায়া ছায়া।

সারাদিন বাতাসের গোঙানি। বাংলোর বিছানায় শুয়ে আকাশ আর সমুদ্র দেখা। পাশের ঘরে মামণির হাতে সেতারের বাজনায় ভেঙে যায় ঝাউবনের নির্জনতা। মিস্টার নায়ার! হাসি পায় সারীর। পরিচয় মামণির বয়ফ্রেন্ড। মিস্টার নায়ার, মাথার সব চুল সাদা। পেটানো শরীর,



ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, নীল জার্সি আর সাদা ট্রাউজার, পায়ে ঘাসের চটি। লোকটার শরীরের সমস্ত লোমকূপও স্পষ্ট। মামণি বলে গ্রীক ভাস্কর্যের মত সুন্দর সুঠাম মিস্টার নায়ার। জাহাজ কোম্পানির বড় অফিসার। অনেক, অনেক ক্ষমতা নাকি লোকটার।

নিজের ভেতর সারী বাপি আর মিস্টার নায়ারকে নিয়ে তর্ক করে। কে বেশি সুন্দর। বাপি কত সোবার আর লোকটা তো ওয়াইল্ড। হাতে মদের গেলাসটা যেন সব সময়ের জন্য আঁটা আছে। মনে মনে বলে, গেলাসটা হাতে নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। একদিনও আর ভাল লাগছে না। চলে যেতে হবে। কলেজ খুলবে। এখন পাশের ঘরে যাবে না। মাঝখানে একটা মোটা জাফরান রঙের পর্দা ঝুলছে। মনে হয় কোনো বিকেলের শেষ রোদটুকুকে কেউ যেন ঘরের ভেতর টাঙিয়ে রেখেছে। এই রোদ-রঙ পর্দাটা আড়াল হয়ে আছে। মামণির সেতারের তারে যত বেশি দরদ চলকে উঠছে ঠিক ততটা দরদ মামণির ভেতর আছে? হয়তো এই দরদ ওয়াইল্ড মানুষটাকে বশে আনতে চায়। ওই সম্মোহনে লোকটা কি কনট্রাক্ট ফর্ম সই করবে? বাপির একটা মোটা টাকার কমিশন ব্যবস্থা হবে মামণি তো যা কিছু করছে সবই বাপির জন্যে।

ডিনারের টেবিলে মুখোমুখি আলোচনার মধ্যে দিয়েই বুঝতে পেরেছে সারী সব ব্যাপার। নায়ার সাহেবের অফিস বাংলোটায় আসার উদ্দেশ্যও তাই। এমন নির্জন নিঃসঙ্গ সমুদ্র সৈকতের ঝাউ বাংলোয় আগে থেকে সব ব্যবস্থাই করা ছিল তারা আসবে বলে। আসার আগেই মামণি প্রায় বার বার সারীকে শিখিয়েছে 'কাকু' বলে ডাকতে। কিন্তু সে রাজি হয়নি। নায়ার ভাল বাংলা বোঝে। সারী আর রেবা মিত্রের মধ্যে একটা জেদাজেদি চলছিল। সারী যখন কিছুতেই মানতে চায়নি তখন রেবা মিত্রের কান্না দেখে মিস্টার মিত্র পরিহাস করে বলেছিলেন, 'রেবা তুমি অমন কথায় কথায় ইংরাজিতে কেঁদে ওঠো কেন।

– ওকে ইগনোর করা মানে কি বুঝেছ

আমি সব বুঝি, সব –

ছাই বোঝ, ইউ নো নাথিং, ইট ইজ এ প্রেস্টিজ ইস্যু।

নো, নো বেবি নো, – ইট ইজ বারগেন

হোয়াট বারগেন

প্রায় ধমকের সুরে কথা বলেন মামণি

রেবা মিত্র, ডিনার টেবিলের খাবার ফেলে উঠে অন্ধকার ঘরে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। সারীর নিজেকে অপরাধী মনে হলেও নায়ারকে কাকু ডাকতে পারেনি।

ঝাউবনে হাওয়ার দাপাদাপি। সেতারের সুর থেমে গেছে। হাওয়ায় ভারী পর্দার বিকেল রঙটা দুলে ওঠে। দুজনের চাপা কণ্ঠে ইংরাজি কথাবার্তা। মনে হয় একজন অন্যজনের শরীরের ভেতর থেকে কথা বলে উঠছে। আপত্তি, নিষেধ, কিছুটা জোর খাটাচ্ছে একজন অন্য জনের উপর। 'প্লিজ' শব্দটা বড় বেশি কাতরোক্তির মত শোনাচ্ছে। মামণির কন্ঠ এত বিনীত হতে পারে সারী ভাবতেই পারে না। যেন অন্য কোনো মেয়েলি কণ্ঠে মামণি কথা বলছে। কথা বলতে চাইছে বাপির আগামী বিজনেসের কমিশনটা। ঘরের ভেতর বিকেলের রঙ ঝুলছে। এক চিরকালের বিকেল যেন ঘিরে আছে সারী, মামণি আর বাপির জীবনের ঘেরাটোপে। বিকেল ক্রমশ গাঢ়তর হয়ে সন্ধে আসে। ঝাউবনে এমন এক সূর্যাস্তে মামণি, বাপি, সারী আর মিস্টার নায়ার এসে গাড়ি থেকে নেমে ছিল। চারিদিক তখন শুধু নোনা বাতাসের লুটোপুটি। দূরে মাঝিদের গ্রামে তখন বিরাট বিরাট কালো নৌকোগুলো পিঠ উল্টে পড়ে আছে আদিম সামুদ্রিক প্রাণীর মত। এই স্থির সূর্যাস্তের রঙ-কে যেন ঘরের মধ্যেও ধরে রাখা হয়েছে। সোফা কৌচ, কুশন সব কিছুতে দিগন্তের রৌদ্র রঙ। এক রাত থেকেই বাপি কলকাতায় ফিরে গেছে। সারীর তখন থেকেই খারাপ লাগতে থাকে। মামণিকে কিছু বলেনি কারণ তার কোনো দুঃখই সে বোঝে না। হয়তো বুঝেও বুঝতে চায় না।

এখন মাত্র তিনজন এই বাংলোতে। এভাবে থাকতে সারীর দুঃখ হলেও থাকতে হবে। মামণির ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার তার কোনো সাহস নেই। মামণিকে ভালবাসে বলেই তাকে আঘাত দিতে চায় না। এই মামণি যখন তার ঠাকুমাকে বাড়িতে থাকতে দিতে চায়নি তখনও ভীষণ খারাপ লেগেছিল। ঠাকুমার দেওয়া নাম ইন্দ্রানী পর্যন্ত মামণি ব্যবহার করে না, তার পরিবর্তে সারী। কোথাও কোনো স্বাধীনতা দিতে চায় না মামণি। মামণি এখনও ওয়াইল্ড মানুষটার সংগে কি করছে। সারারাত কি এইভাবে লোকটার সংগে মামণি কাটাবে। এই কথাটা মনে হতেই একটা ক্রোধ কান্নার দলা হয়ে বুকের মধ্যে পাকিয়ে ওঠে।

সারী নিজের অজ্ঞাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে। নিজের মনে বলে, মামণি, মামণি আমি তোমাকে খুউব ভালবাসি, আমার ভালবাসাকে তুমি নষ্ট কর না মামণি। বালিশে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সারী। পাশের ঘর নিস্তব্ধ। বালিশে মুখ গুঁজে কতক্ষণ ছিল মনে পড়ে না। তন্দ্রার মধ্যেই ঘটনাটা ঘটেছিল। চোখ মেলতেই মনে হয় এই বাংলোটা একটা দিকচিহ্ন হারানো জাহাজের মত ভেসে যাচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে। ঝাউবনে উন্মত্ত বাতাস গুমরে গুমরে উঠছে। একটা শ্বাপদ তখনও বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে চায় বাদামি চামড়ার শরীরটা। তলপেটের নিচে অসহ্য যন্ত্রণা। মামণি নেশায় বেঘোর হয়ে সোফাতে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে বিকেলের রঙ।

পাইরেটদের গল্পের বইয়ের জলদস্যুর মত লোকটা উঠে সব কিছু লুট করছে। লুঠ করছে, জলদস্যু এঘর ও ঘর। জাহাজে কোনো নাবিক নেই। 'বাপি' বলে চিৎকার করে ডাকতে গিয়েও সারীর কণ্ঠে কোনো আওয়াজ ফোটে না। মামণি শব্দটা জমাট একটুকরো বরফের মত আটকে আছে কন্ঠনালীতে। জলদস্যুটার শরীরের সমস্ত লোমকূপেও কামনার গন্ধ।

মুখে মদের গন্ধ। বেবি, বেবি শব্দটা জড়ানো মাতলামিতে যেন এলিয়ে পড়ছে। সারীর অনাবৃত শরীরটাকে একটা শ্বাপদের ক্ষুধায় খেতে চাইছে। সারী চোখ বোজে। লোকটা সূর্যাস্তের জলদস্যু।

সুখচাঁদের মা এসে বিছানার পাশে দাঁড়াতে সারী পাশ ফেরে চিন্তার তরংগে এখনও মনে হয় যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আছে। সুখচাঁদের মা বলে, 'খোকি, দুধ খাবে? খাবার দেব?'

'নাহ্'।

'কেন খোকি, তবিয়ত ঠিক নেহি, রামজীর কৃপা সে সব কুছ ঠিক হয়ে যাবে'

সুখচাঁদের মার ভাঙা বাংলায় কথা সারীর খুব ভাল লাগে।

'আচ্ছা সুখচাঁদের মা, তুমার কেতনা উমর মে শাদি হুয়া।'

'শাদি বহুত ছোটা সময। ও আমার ইয়াদ নেহি।'

'তোমার সুখচাঁদের জনম হয়েছিল কেতনা উমরে

'চৌদ কি পনর সাল উমরে।'

সারী আর সুখচাঁদের মায়ের কথার মাঝে বিন্দি আয়া এসে ঢুকে পড়ে বিন্দি এ বাড়িতে আছে অনেকদিন। বিহারের ছাপড়ায় বাড়ি। পরপুরুষের সংগে ঘর পালিয়ে এসে কলকাতায় ঠেক নিয়েছিল। লোকটা পালিয়ে গেছে। কিন্তু পেটে একটা বাচ্চা দিয়ে গিয়েছিল। মামণি শেষ পর্যন্ত বাচ্চা নষ্ট করে ওকে বাড়িতে রেখেছে। কারণ সারী জানে মামণির মতে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের কোনো মানবিক দিক নেই। গর্ভপাত আইনসিদ্ধ। সুন্দর করে সেজেছে বিন্দি। হয়তো পার্কে কোনো ছেলের সংগে প্রেম করে। খোপাতে একটা বাসি ফুলের মালা জড়ানো আছে। বাসতেল আর শুকনো মালার একটু ম্রান গন্ধ নাকে এসে লাগে সারীর। বিন্দি বলে, 'দিদিমণি পার্কে যাচ্ছি।' এখন ওর কুকুর নিয়ে বেড়াতে যাবার সময়। বাড়ির নির্জনতাকে কুকুরের ডাক খানখান করছে। এই সময় কুকুরগুলো অস্থির হয়ে ওঠে। বিন্দিও পার্কে যাবার জন্যে ছটফট করে।

'খোকি উঠো, চুল বাঁধ। মাইজি আসলে রাগ করবে। মাইজির আসার সময় হল

বিন্দি নিঃশব্দে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে কুকুরের ডাকও আস্তে আস্তে লন পার হয়ে বাড়ির বাইরে চলে যায়। এখন আবার নির্জনতায় বাড়িটা ডুবে যেতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ সুখচাঁদের মায়ের সংগে এলোমেলো কথা বলে সারী।

মিষ্টি জলতরংগের সুরে কলিংবেল বেজে ওঠে। সুখচাঁদের মা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। 'মাইজি এসেছে' বলে। সুখচাঁদের মাকে খুব ভাল লাগে সারীর। সে যেন তুলসীদাসী রামচরিতমানসে ডুবে আছে। জানকীর দুঃখের সংগে জগৎসংসারের সব দুঃখ একাকার হয়ে গেছে। সীতার অগ্নিপরীক্ষার আগুনের উত্তাপ যেন সুখচাঁদের মার হৃদয়ের উষ্ণতা। বড় বিশ্বাসী সে। জীবনে সে কোনো বিশ্বাস হারায়নি। ঈশ্বর, পতিপ্রেম, ন্যায় নীতি সব কিছুই তার জীবনে ধ্রুব সত্য।'

মামণি আর জলদস্যুটা উপরে উঠছে কথা বলতে বলতে। বিরাট কাঠের সিঁড়িতে তাদের পায়ের শব্দ। লোকটা অনেকটা হায়নার মত হাসে। ভীষণ ক্ষুধার্ত তার হাসি, কথাবলা এমন কি

লক্ষ লক্ষ সুখী ইউলিপ সদস্যদের সাধারন বৈশিষ্ট্য কি ?

সঞ্চয়ের উপর আয়কর ছাড়ের বিশাল সুবিধালাভ
উচ্চহারে প্রতিদানের বিশেষ সুবিধাভোগ



উচ্চহারে প্রতিদান আর আয়কর আইনের ৮০C ধারা অনুযায়ী আয়কর ছাড়, এই দুইয়ের সমন্বয় বিনিয়োগকারীদের কাছে ইউনিট লিংকড ইনস্যুরেন্স প্ল্যান-কে অন্যতম আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

এছাড়া ইউলিপে আছে আরও নানান সুবিধা।

- **ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়াই জীবনবীমা**
- **বিনা খরচে দুর্ঘটনা বীমা**
- **আকর্ষণীয় প্রতিদান (১৯৮৬-৮৭ সালে ১৩.২৫% হারে)**
- **মেয়াদ শেষে ৫% থেকে ৭.৫% হারে বোনাস**

১৮ থেকে ৫০১/২ বছর পর্যন্ত যে কেউ ইউলিপে যোগ দিতে পারেন। শুধু যা আপনাকে করতে হবে তা হল বছরে ২০০ টাকা থেকে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ। আপনার সামনে খোলা থাকবে ১০ বা ১৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা থেকে ইচ্ছেমত বেছে নেবার সুযোগ।

ইউ টি আই কার্যালয়, মুখ্য প্রতিনিধি, এজেন্ট বা নিকটবর্তী ইউকো ব্যাঙ্ক শাখাতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।

আমাকে অনুগ্রহ করে বিনামূল্যে একটি ইউলিপ পুস্তিকা পাঠান।

নাম ____________________

ঠিকানা ____________________

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

(একটি সরকারী ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)

প্রধান কার্যালয় : ১৩, স্যার বিঠলদাস থ্যাকারসে মার্গ, (নিউ মেরিন লাইন্‌স্‌) বোম্বাই ৪০০ ০২০ ফোন ২৮৬৩৭৬৭

আঞ্চলিক কার্যালয়

১ ফেয়ারলি প্লেস, কোলকাতা ৭০০ ০০১ ফোন ২০১৩৯১, ২০৫৫২২

শাখা কার্যালয়

পান বাজার এল আই সি আই বিল্ডিং, এম এল এন রোড, গুয়াহাটি ৭৮১ ০০১, ফোন ২৫১৫১

প্রাণ নিবাস, ২৪১ লুইস রোড ভুবনেশ্বর ৭৫১ ০১৪ ফোন ৫১২৪১

জীবন দীপ বিল্ডিং, এক্সিবিশন রোড, পাটনা ৮০০ ০০১ ফোন ২২৪৭০



চোখের চাহনিতে একটা তৃষ্ণার পেয়ালা যেন উপুড় করা আছে। সারী এখানে শুয়ে অনুভবে স্পষ্ট দেখতে পায় জলদস্যুর মত মানুষটা লুটপাট করে বড় শ্রান্ত। মামণি বলে, 'তোমার বাপির কেরিয়ারের জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি। আমি উজাড় করে দিয়েও তোমার বাপির মন পেলাম না।

পাশের ঘরে দু'জনেই ঢুকে যায়। মেরুন রঙের কার্পেট মাড়িয়ে দুটো শরীর চলে গেল। চলে গেল হায়নার হাসি আর সেতারের সুর। এখনই হয়তো সেতারে বেজে উঠবে পূরবী। নির্জন বাড়িটা আস্তে আস্তে ডুবে যাবে সূর্যাস্তের সোনায়। ডুবে যাবে মামণি আর জলদস্যু গভীর শব্দহীনতায়। চাপা কথায় কান পাতলে শোনা যাবে 'প্লিজ' শব্দটার কাতরানি। সারী বুঝে উঠতে পারে না মামণি এত বিনীতভাবে 'প্লিজ' 'প্লিজ' করে কাতরায় কেন! মামণির কোনো যন্ত্রণাবোধ আছে! তাহলে ওই ওয়াইল্ড মানুষটাকে বরদাস্ত করে কী ভাবে!

হঠাৎ মামণি এঘরে চলে আসে। সারীকে বিছানায় দেখে রুক্ষ কণ্ঠে জিগ্যেস করে, 'এ কী তুমি এখনও শুয়ে আছো? ওঠো সারী বি ফ্রেস, বি ব্রাইট। আজ আমাদের এখানে কারা আসবেন জানো, — অল আর ম্যাগনেটস ইন বিজনেস ওয়ার্ল্ড।

এখন মামণিকে দেখে সারীর বুকের ভেতর আক্রোশের নখ আঁচড় কাটে। মনে হয় মামণিকে সে ঘৃণা করে। শুধু বুঝে উঠতে পারে না ঘৃণার কারণটা কী। এখন স্পষ্ট, একটা অসহ্য যন্ত্রণা নিজের শরীর ও মনের ভেতর যেন কুণ্ডলী পাকিয়েছিল। আক্রোশ ফণা তুলছে। হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে সারী, 'প্লিজ, মামণি তুমি বেরিয়ে যাও। আমার কিস্যু ভাল্লাগে না। প্লিজ ডিসটার্ব করবে না।'

মিসেস রেবা মিত্র এতদিন পরে তার নিশ্চিন্ত অস্তিত্বের ভূমিতে যেন মৃদু কম্পন অনুভব করেন। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভূতগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে মেয়ের মাথায় গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে জিগ্যেস করেন, 'সারী মাই বেবি, হোয়াই ইউ আর সো ইমপেশেন্ট, টেল মি হোয়াই।' 'নো, নো, আই উইল নট টেল ইউ এনিথিং — প্লিজ' — আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে সারী। মামণি রেবা মিত্র ঘর থেকে বেরিয়ে যান। বাইরে থেকে লক করে দেন ঘরটা।

সারী কান্নার মধ্যে সমস্ত শরীরের কোষে কোষে এক নিষ্ঠুর ঘৃণার ছোবল অনুভব করে। মনে হয় সে পাগল হয়ে যাবে।

চেতনায় সারী তার সবকিছুকে হারিয়ে ফেলছে। সেই ঝাউ বাংলোর স্মৃতি, হায়নার হাসি আর সেতারের তারে সুরের কাঁপন এক হয়ে গেছে। সেতার এখন হায়নার কণ্ঠে হাসছে। হায়না এখন সেতারের ঝালার মত উদ্দাম হয়ে হাসছে। হাসতে হাসতে এই বাড়িটাকে একটা গহীন জঙ্গলের মত করে ফেলেছে। একটা জঙ্গলের মধ্যে সবাই হারিয়ে যাচ্ছে। বাপি, মামণি সুখচাঁদের মা, বিন্দি আর তার পার্কের প্রেমিক যুবকটি। জলদস্যুটা জাহাজডুবির পর সেই জঙ্গলে এখন হায়না হয়ে গেছে। হায়নার হাসি এখন সেতারের বাজনার মত শুনতে লাগে। চোখ মুছে সারী বিছানায় উঠে বসে। ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করে সারী। সমস্ত শরীরের যন্ত্রণায় ম্যাকসি খুলে ফেলে সারী। নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। অনাবৃত শরীরে পুতুলের আলমারির সামনে এসে দাঁড়ায় সারী। ছোট বেলার খেলার পুতুল। দু'একটা পুতুল জীবন্ত শিশুর মত গোলাপি কোমল ত্বকের। মানুষের শিশু সন্তানের মত কাঁদে। কতদিন এই পুতুলগুলোকে নিয়ে খেলা করেনি ভাবে সারী। কাচের আলমারিতে শৈশবের সুখ বন্দী হয়ে আছে।

একটা পুতুল আলমারি থেকে বার করে সারী সন্তানের স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে। পুতুলটা শিশুর মত কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। যন্ত্রের পুতুল কাঁদে, যন্ত্রণায় মানুষ যেমন কঁকিয়ে কাঁদে। সারী পরম মাতৃস্নেহে কাঁদুনে পুতুলকে স্তন বৃন্তের ওপর চেপে ধরে। আপন মনে নাচতে থাকে। পাশের ঘরে এতক্ষণ পরে স্টিরিয়োতে বিদেশী সুরের বাজনা বাজছে। আস্তে আস্তে এবাড়ি উদ্দাম হয়ে উঠছে। সারী নামের নিঃসঙ্গ আতঙ্কিত কিশোরীএকদিন জলদস্যুর মত মানুষটির বিষ শরীরে নিয়ে মাতৃত্বের দুঃস্বপ্নের ঘোরে ছিল। এখন সে পুতুলের মা হয়ে নগ্ন দেহে উদ্দাম বিদেশী বাজনার তালে তালে বন্ধ ঘরে নাচে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। দম দেওয়া পুতুলের কান্নায় মানুষের যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি এক হয়ে যাচ্ছে।

স্মরণ

সন্তোষ দত্ত

অভিনয়ের জগৎ থেকে বিদায় নিলেন সন্তোষ দত্ত। বাংলা ছবির জগতে সবাই যাঁকে জটায়ু বলেই বেশি চেনে। জটায়ু ছাড়াও গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এ তাঁর অভিনয় চিরকাল ভাস্কর থাকবে।

পেশায় উকিল, অমায়িক সন্তোষ দত্ত হাসির অভিনয়ে এক যুগান্তর এনেছিলেন। কোথাও জোর করে হাসাবার চেষ্টা নেই হৃদয়ের অকপট সৌন্দর্য দিয়ে তিনি ফুলের মতো একরাস হাসিকে পর্দায় রূপায়িত করতেন। শুধু চলচ্চিত্রে নয়, সাধারণ রংগমঞ্চেও তাঁর অভিনয় ছিল এক কথায় চমকপ্রদ

সহজ অনাড়ম্বর বন্ধু বৎসল মানুষ ছিলেন তিনি। সকলেই এক কথায় তাঁর বন্ধু ছিলেন।

অভিনয় ব্যাপারটাকে শিখতে হয়নি তাঁর। অন্তর থেকে একটা সহজ প্রাণোচ্ছল অভিনয়কে তিনি রূপায়িত করেছেন প্রতিটি চরিত্রানুযায়ী তিনি শেখেননি কিন্তু বহু পরবর্তী অভিনেতা তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

যেমন অভিনয় তেমনি আলাপের স্বচ্ছতাও তাঁর অনন্যতা প্রকাশ করে গল্প বলবার কায়দায় তিনি সকলকে মুগ্ধ করে রাখতেন ঘন্টার পর ঘণ্টা। চলচ্চিত্র জগতে সবাই তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েছিল আলাপের পরদিন থেকেই।

সত্যজিৎ রায়ের পরশ পাথর ছবিতে সন্তোষ দত্ত প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তার পর বিভিন্ন ভূমিকায় আশ্চর্য এক নিজস্ব জগৎ তৈরি করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর অকালপ্রয়াণ বাংলা চলচ্চিত্র জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি নিঃসন্দেহে। তাঁর প্রয়াত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

সুশীল মজুমদার

সে যুগের সাড়া জাগানো বাংলা ছবি 'রিক্তা'র নাম এখনো অনেক প্রবীণ মানুষ ভোলেননি। এই রিক্তা ছবির পরিচালক ছিলেন সুশীল মজুমদার। নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগে উত্তরণে সুশীল মজুমদারের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দুই ছিল। তিনি একাধিক হিট ছবির পরিচালক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

শুধু পরিচালক নয়, অভিনেতা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি অনবদ্য। সিনেমা অভিনয়ে স্বাভাবিকতার দিকে যে কজন ঝুঁকে ছিলেন সুশীলবাবু তাঁদেরই একজন। একটি চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে কী ধরনের অভিনয় প্রয়োজন তা তাঁর অভিনীত প্রত্যেকটি চরিত্রতেই প্রকাশিত।

তাঁর শেষ হিট ছবি উত্তমকুমার অভিনীত লাল পাথর। বাংলা ও হিন্দী দু ভাষাতেই ছবিটি বিরাট ব্যবসায়িক সাফল্য নিয়ে এসেছিল।

দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে একাকিত্বে যন্ত্রণায় ভুগছিলেন এই সৃষ্টিশীল মানুষটি। এক পরিশীলিত মন নিয়ে চলচ্চিত্রে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শেষ জীবন কেটেছে খুবই কষ্ট ও অভাবের মধ্যে।

মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন আগে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পান। পশ্চিমবংগ সরকার তাঁর চিকিৎসার জন্যে দশ হাজার টাকা এককালীন অর্থ দান করেন। কিন্তু সেই অর্থসাহায্য আর কিছুদিন আগে পেলে হয়তো তিনি আরেকটু শান্তি নিয়ে যেতে পারতেন। এককালের বিখ্যাত অভিনেত্রী আরতি মজুমদার ছিলেন সুশীলবাবুর সহধর্মিণী। সুশীলবাবুর প্রয়াত আত্মার সদগতি কামনা করি।

অখিলবন্ধু ঘোষ

চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের জগতের গানের জলসায় যে মানুষটির সুরেলা কণ্ঠের উপস্থিতি শ্রোতাদের অদ্ভুত এক অনুভূতিতে দুলিয়ে দিত তাঁর নাম অখিলবন্ধু ঘোষ। তাঁর গলায় যেন সম্মোহের জাদু ছিল।

অখিলবন্ধু ঘোষ কি গান ভাল গাইতেন তা বলা খুবই মুশকিল। খেয়াল, ভজন, ঠুংরি, রাগপ্রধান, আধুনিক ও নজরুলগীতি সবকিছুতেই তাঁর অনায়াস দখল ছিল। বিশেষ করে ভাঙা রাগপ্রধান গানের তিনি মুকুটহীন রাজা ছিলেন। এখনো চোখ বুজলে কানে ভেসে ওঠে, শিপ্রা নদী তীরে বা মায়ামৃগ সম ইত্যাদি গানের মাতাল করে দেওয়া সুর। তাঁর কণ্ঠের পিয়াল শাখার ফাঁকে একখানি চাঁদ বাঁকা ওই গানটি বহু বহুদিন স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

দরদী এক কণ্ঠশিল্পী মানুষের হৃদয়ের অধীশ্বর হয়ে যা তাঁর প্রাপ্য তা পেলেন না। নিরাভরণ সংগীত জীবন কাটিয়েই তিনি হঠাৎ চলে গেলেন। অখিলবন্ধুর রেকর্ড সংখ্যা আশিটির মতো। এই দীর্ঘ দিনে মাত্র আশিখানা রেকর্ড। ভাবা যায় না।

প্রয়াত উচ্চাংগসংগীত শিল্পী তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে অখিলবন্ধু তালিম পেয়েছিলেন। যদিও উচ্চাংগসংগীত নিয়েই তিনি আবদ্ধ থাকেননি। গান গেয়ে মানুষকে আনন্দ দেবার ব্যাপারটিই তাঁর কাছে মুখ্য ছিল, ব্যবসায়িক কৃত্রিমতা ছিল না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি গান শুনিয়ে গেছেন।

তাঁর প্রয়াণে বাংলা গানের সমৃদ্ধ যুগের এক ইন্দ্রপতন ঘটল। সুর সাধককে শেষ শ্রদ্ধা জানাই। কামনা করি তাঁর আত্মার কল্যাণ। □

অজয় দাশগুপ্ত

সংস্কৃতি সংবাদ

দুই বাংলার নজরুলগীতি সম্মেলন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিক অডিটোরিয়ামে গত ১৬, ১৭, ১৯, ২০ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায় দ্বিতীয় 'দুই বাংলা নজরুলগীতি সম্মেলন' হয়ে গেল। উদ্যোক্তা 'অগ্নিবীণা'। সংস্থার পক্ষ থেকে জানান হল ১৯৬৭ সালে কবিপুত্র কাজী সব্যসাচীর আন্তরিক চেষ্টার ফল হচ্ছে এই 'অগ্নিবীণা'। 'অগ্নিবীণা'র প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক ছিলেন কাজী সব্যসাচী এরপর ১৯৭৮ সালে রবীন মুখোপাধ্যায় 'অগ্নিবীণা'র সম্পাদক পদে আসীন হন। বর্তমানে তিনিই সম্পাদক আছেন। সভানেত্রী হিসেবে নাম রয়েছে ডঃ রমা চৌধুরীর। সংস্থাটির উদ্দেশ্য মহৎ – দুই বাংলার শিল্পীদের দিয়ে প্রতি বছর নজরুলের জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন পালন করা। এবছর 'অগ্নিবীণা' তাদের দ্বিতীয় বার্ষিক দুই বাংলা নজরুল সংগীত সম্মেলন করলেন কলকাতায়। ১৯৮৫ সালেও কলকাতাতেই এপার ও ওপার বাংলার শিল্পীদের নিয়ে আরো একটি অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। এছাড়া ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশের নজরুল অ্যাকাডেমির সভাপতি তালিম হোসেনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঢাকায়ও এইরকম একটি নজরুল সম্মেলন হয়েছে। এই ধরনের অনলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য 'অগ্নিবীণা'র উদ্যোক্তাদের নিঃসন্দেহে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রাপ্য।

চারদিনের এই দুই বাংলা নজরুলগীতি সম্মেলনে শিল্পী (নামী-দামী মিলিয়ে) ছিলেন কমপক্ষে বাহাত্তর জন।

নতুনদের মধ্যে খুব বেশি আশা জাগিয়েছেন চন্দ্রাভা চক্রবর্তী। তার 'আধো আধো বোল' (গজল/কাহারবা) গানটির পরিবেশনা তুলনাহীন। নবীন শিল্পীদের মধ্যে আর যাঁরা সাড়া জাগিয়েছেন, তাঁরা হলেন – রত্না কুণ্ডু, কৃষ্ণা মজুমদার, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীতা বসু রায়, মানসী মুখোপাধ্যায় (মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে)। নজরুলের দুটি গানের



মেহেরুন্নেসা খানম টুকটুক

একটিতে ('হে পার্থ সারথী বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ' শিবরঞ্জনী/ত্রিতাল) মাতিয়ে দিয়েছেন মায়া মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় গানটিও সুন্দর মেজাজে গাওয়া।

নজরুলগীতির সুপরিচিত শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই যিনি আশাহত করেছেন তিনি পূরবী দত্ত। তাঁর তিনটি গানের মধ্যে 'এ কোন মধুর শরাব দিলে আল্ আরাবী সাকী' শুনতে ভাল লাগে। টপ্পা অঙ্গের একটি গানে 'আজি এ কুসুমহার দলি কেমনে' (ত্রিতাল) একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন প্রবীণ শিল্পী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য



সংগীতা বসু রায়

মেহেরুন্নেসা খানম। তাঁর গাওয়া 'তুমি সারা জীবন দুঃখ দিলে তব দুঃখ দেওয়া কি ফুরোবে না' দরদী পরিবেশন। মায়াময় তাঁর কণ্ঠ। অন্য দুটি গানেও শিল্পী যথেষ্ট আশা জাগিয়েছেন। এছাড়া ভাল গেয়েছেন আফরোজা ইয়াসমিন, জান্নাত আরা, মানসকুমার দাস এবং অভিজিৎ সাহা।

জ্যোতির্ময় রায়

মৌনমুখরের মৌনসন্ধ্যা

সম্প্রতি গোর্কি সদনে মূকাভিনয় সংস্থা 'মৌনমুখর' তাদের তৃতীয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান করলেন। ওই সন্ধ্যায় সংস্থার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সাংস্কৃতিক জগতের তিন দিকপাল অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভি বালসারা ও রুমা গুহঠাকুরতাকে। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতাস্থিত রুশ দূতাবাসের এল ফসকিশ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শুরু হয় মূকাভিনয়। একক মূকাভিনয় পরিবেশন করেন শান্তিময় রায় এবং সমবেত মূকাভিনয় অভিনীত হয় তাঁরই পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়। প্রত্যেকটি উপস্থাপনাই ছিল ভাবনাচিন্তা ও অভিনয়ের পরিণতির ফসল। কবি সুকুমার রায়ের কবিতা অবলম্বনে 'নিখোঁজ চশমা' একটি ভাল উপস্থাপনা। 'আশ্রয়' এই সন্ধ্যার অন্যতম সেরা উপস্থাপনা। এটি আন্তর্জাতিকভাবে পালিত আশ্রয়হীনদের আশ্রয়দানের বর্ষকে উদ্দেশ্য করে নিবেদিত। এক আশ্রয়হীন রিক্সাওয়ালার আশ্রয়ের স্বপ্নকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক এই ফিচারটি মনকে নাড়া দেয়। 'হা-ডু-ডু' খুব সহজেই দর্শককে উদ্বেল করে তোলে। 'শিল্পী' ফিচারটিতে শিল্পীর মানসিক উত্তরণের পর্বকে মূকাভিনেতা শান্তিময় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'জাতিভেদ' নিবেদনটিতে আমাদের সমাজের দুষ্টক্ষত এই অসামাজিক প্রথাটির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে।

'শিল্প ও শিল্পী' ফিচারটি আরও পরিমার্জন প্রয়োজন। এ ছাড়া আরো একটি ভাল ফিচার 'দুই বিঘা জমি' - দর্শকদের মন কেড়েছে। এই ফিচার অভিনয় আঙ্গিকে বিশেষ করে জোনাল অ্যাকটিং



মূকাভিনয়ের জগতে এক নতুন মাত্র যোগ করেছে। উপেনের চরিত্রে শান্তিময় রায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কল্যাণ সেন বরাট ও শক্তি নাগ-এর আবহসংগীত যথাযথ। সুখময় রায়ের ধ্বনি প্রক্ষেপণ ভাল, কিন্তু দেবাশিস ভট্টাচার্যের আলো সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত ছিল না।

বিশেষ প্রতিনিধি

বিদেশিনীর সুরের মূর্ছনায় তান মঞ্জুরী

৫ মার্চ সন্ধ্যায় গোবরডাঙ্গা টাউন হলে 'তান মঞ্জুরী'র সংগীত সন্ধ্যায় শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিলেন হল্যান্ড নিবাসী মিস ক্যারোলিন। ক্যারোলিন গাইলেন, জয় করলেন, চলে গেলেন।

এই বিদেশিনীদের আমরা দেখতে অভ্যস্ত পপ সঙ আর ক্যাবারে ড্যান্সের আসরে। শাড়ি পরে তানপুরা হাতে কোন বিদেশিনীকে উচ্চাঙ্গ সংগীত গাইতে দেখলে তো চমক লাগবেই। ভারতীয় মার্গ সংগীতের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ কেন? কি যাদু তিনি খুঁজে পেয়েছেন এর মধ্যে?

কৌতূহল মেটালেন ক্যারোলিন নিজেই। সাত বছর ধরে বছরের সাত আট মাসই ভারতে এই কলকাতায় থাকেন। গুরুর কাছে তালিম নেন। গুরু প্রবীণ শিল্পী বীরেশ রায়। দেশে (হল্যান্ড) বাবা, মা ভাই, বোন আছেন। বাবা জল পুলিশের সার্জেন ছিলেন। এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। ভাই পপ সঙ গায়ক।

গুরু বীরেশ রায়ের গানের স্কুল আছে হল্যান্ডে। ওখানেই গুরুর সঙ্গে পরিচয়। উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার হয়ে ওঠে ক্যারোলিনের। গুরুর কাছে তালিম নিতে নিতে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেন। নবজন্ম হয় ক্যারোলিনের। নিজের দেশের গান ভাল লাগে না, বড় কৃত্রিম মনে হয়। সে গানের আবেদন তো স্থায়ী হয় না ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের মত। এ গানের মত প্রাণের ছোঁয়া কই

বি এ পাশ করার পর ক্যারোলিন মন স্থির করে ফেলেন। চলে আসেন এ দেশে। গুরুর তালিম নিয়ে নিজেকে গড়ে তোলেন ধীরে ধীরে। কঠোর তপস্যায়



মিস ক্যারোলিন বেহাগ রাগে খেয়াল গাইছেন

আংশিক হলেও সিদ্ধিলাভ করেছেন। গুরুর যোগ্য শিষ্যা হয়ে উঠেছেন। ক্যারোলিন তাই খুশি। বোম্বে দিল্লি গেছেন অনুষ্ঠান করতে। তবুও ভাল লাগে কলকাতাকে। কারণ কলকাতার মানুষ প্রাণ খুলে মিশতে জানে। আরও দু-এক বছর থেকে দেশে ফিরে গিয়ে গানের স্কুল খোলার ইচ্ছে আছে তাঁর। কারণ ওদেশের ছেলেমেয়েরাও ওর মত ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ওপর আগ্রহী।

তান মঞ্জুরীর সংগীত সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পী দিলীপ বন্দোপাধ্যায়ের রাগেশ্রী দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়েছিল। পরের শিল্পী কৌস্তব রায় সরোদে শোনালেন কিরমানি।

অনুষ্ঠানের সর্বশেষ আকর্ষণ ছিলেন প্রবীণ শিল্পী বীরেশ রায়। বিদগ্ধ এই শিল্পীর কণ্ঠে শোনা গেল পিলু রাগের ওপর একটি চৈতি, একটি হোরি দাদরা এবং দেশ রাগে একটি ঠুংরি। এসব গানে শিল্পী যে এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী তার প্রমাণ আর একবার পাওয়া গেল। শিল্পীদের সঙ্গে তবলায় সুসংগত করেছেন রতন সরকার, বীরেশ্বর ভৌমিক, সুশান্ত চন্দ।

সত্যব্রত দাস

সংগীত-নৃত্য নিয়ে যে মেলা

সম্প্রতি শুধু সংগীত-নৃত্য-বিষয়ক একটি মেলা হয়ে গেল কলকাতায় বিড়লা তারামণ্ডলের বিপরীতে ময়দানে। উদ্যোক্তাদের দাবি এই ধরনের উদ্যোগ কলকাতায় এই প্রথম। মেলার মুখ্য আকর্ষণ ছিল দুটি প্রদর্শনী। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র-বিষয়ক প্রদর্শনীতে ছিল কিছু প্রাচীন এ দুষ্প্রাপ্য যন্ত্রাদি। স্বনামধন্য যদুভট্টের তানপুরা, প্রখ্যাত সরোদিয়া রাধিকামোহন মৈত্রর ব্যবহৃত সরোদ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। সংগীত-নৃত্যের প্রদর্শনীতে ভারতীয় সংগীতের গৌরবময় অতীত, পরম্পরাগত ঐতিহ্য এবং সমকালীন গতিপ্রকৃতি-বিষয়ক ছবি তথ্য-সহযোগে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রচেষ্টাটি সাধুবাদ-যোগ্য।

সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে



অমিতা দত্ত : নৃত্যের ছন্দে

বহু নবীন শিল্পী সুযোগ পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল প্রয়াত দুই সংগীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও শ্যামল মিত্র স্মরণে দুটি সন্ধ্যা। শেষোক্ত সন্ধ্যায় স্মৃতিচারণ-সংগীত-আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সেবাব্রত গুপ্ত, বিমান ঘোষ, সন্ধ্যা সেন, হৈমন্তী শুক্লা, উৎপলেন্দু চৌধুরী, রজত বন্দোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ মতিলাল, সৈকত মিত্র প্রমুখ। নৃত্যে অমিতা দত্ত (কত্থক), সুচিত্রা মিত্র (ভরতনাট্যম), মোনালিসা ঘোষ (ওড়িশী), বিভিন্ন দিনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ক্যালকাটা কয়্যার, অজিত পান্ডে, সাজ্জাদ হোসেনের অনুষ্ঠানও উল্লেখ-যোগ্য।

বিশেষ প্রতিনিধি

স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা



ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন বয়সী মহিলারা প্রায়ই বাতের ব্যথায় কষ্ট পান। কোমরে, পিঠে, ঘাড়ে যন্ত্রণা কিংবা ঠাণ্ডা লেগে মুখ বেঁকে যাওয়া, নিঃশ্বাসের কষ্ট এরকম অসুস্থতায় আজকাল অনেকেই বিব্রত। এই ধরনের অসুস্থতায় স্টেরয়েড ওষুধ আর ইনজেকশনে যাঁরা জর্জরিত, যাঁরা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছেন কিংবা যাঁদের ক্ষেত্রে যন্ত্রণা কমানোর ওষুধ অন্য উপসর্গ সৃষ্টি করে, তাঁরা ফিজিওথেরাপি করাতে পারেন। ফিজিওথেরাপি কী আর এ চিকিৎসার সীমানাই বা কতটুকু এই চিকিৎসায় কোন কোন রোগ সারে এবং কী কী সাবধানতা অবলম্বন করলে অবাঞ্ছিত কিছু রোগ এড়ান যায়, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ফিজিওথেরাপিস্ট দীপক চট্টোপাধ্যায়।

প্রশ্ন : ফিজিওথেরাপি কী?

উত্তর : 'ফিজিওথেরাপি' একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি। এই চিকিৎসাপদ্ধতির অংগ হল বিশেষ ধরনের ব্যায়াম যা সহজেই যেকোনো বয়সের লোক করতে পারেন। এছাড়া ম্যাসাজ,ট্র্যাকশন, নানারকম রশ্মির (Ray) ব্যবহার এবং হাইড্রোথেরাপি, আলট্রাসাউন্ডথেরাপি, ইলেকট্রোথেরাপি প্রভৃতি যান্ত্রিক সাহায্যও নেওয়া হয় এতে। তবে এই চিকিৎসায় কোনোরকম ওষুধ বা 'ড্রাগ' ব্যবহার করা হয় না।

প্রশ্ন : কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে আমরা ফিজিওথেরাপির সাহায্য নিতে পারি

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের বাত রোগে যেমন, সারভাইকাল স্পনডিলোসিস (ঘাড়ে বাত), লো ব্যাক পেন, কোমরে ব্যথা, লাম্বার স্পনডিলোসিস (কোমরে বাত), পোস্ট পোলিও-প্যারালোসিস, নার্ভকাট ইনজুরি, আংশিক পক্ষাঘাত, ফ্রোজেন সোল্ডার, প্রোল্যাপ্স ইনট্রাভার্টিব্রাল ডিস্ক (কোমরে বাত), ফেসিয়াল নার্ভ পলস বা ঠাণ্ডা লেগে মুখ বেঁকে যাওয়া, মবিলাইজেশন অফ স্টিফ জয়েণ্ট বা হাঁটু, কনুই, গোড়ালি ইত্যাদি সন্ধিস্থানের কাঠিন্য, রিউম্যাটিক আর্থরাইটিস (সন্ধিস্থানের বাত), অস্টিও আর্থরাইটিস (হাড়ে বাত), স্পোর্টস ইনজুরি, পেশীতে ব্যথা, কুষ্ঠ রোগে নার্ভ অকেজো হয়ে যাওয়া, হাঁপানি প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। মেদ কমাবার বা ওজন কমাবার জন্যও অনেকে ফিজিওথেরাপি করান। এছাড়া অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সুস্থভাবে সন্তান প্রসবের জন্যও কিছু হালকা ব্যায়ামবিধি আছে, যা ফিজিওথেরাপির অন্তর্ভুক্ত।



এভাবে ঘর পরিষ্কার করুন



দাঁড়িয়ে রান্না করুন



ঝুঁকে ভারী জিনিস তুলবেন না

প্রশ্ন : প্রায়ই মহিলারা কোমর এবং ঘাড়ের যন্ত্রণায় কষ্ট পান। এটা কেন হয়? এর থেকে রেহাই পাবার উপায় কী?

উত্তর : মেয়েদের কোমরে ব্যথা নানা কারণে হয়। প্রসবের পরেও এই ব্যথা দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে মেয়েদের নানারকম ঘরের কাজ করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে থাকে। যেমন, কোনো ভারী জিনিস তুলতে যাওয়া, ঝুঁকে কোনো কাজ করা, ঝুঁকে বসে ঘর মোছা, ভিজে কাপড়ে বহুক্ষণ থাকা, ঘাড় গুঁজে গল্পের বই পড়া ইত্যাদি। আবার যাঁরা অফিসে কাজ করেন, তাঁদের একভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকা, মাথা হেঁট করে টেবিলে কাজ করা এসব নানা কারণ থাকে। এর থেকে রেহাই পেতে গেলে প্রি কশান হিসাবে আমরা কিছু ব্যবস্থা নিতে পারি। যেমন, (১) ফিজিকাল ফিটনেসের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করা। (২) নরম বিছানায় না শোওয়া। মাথার বালিশ পাতলা রাখা (যেন তিন ইঞ্চির বেশি মোটা না হয়)। (৩) ঝুঁকে কাজ না করা। মেঝে পরিষ্কার বা ঘর ঝাঁট দেওয়ার জন্য একটি শক্ত বড় লাঠির সংগে ঝাঁটা বেঁধে নেওয়া এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুহাতে লাঠি ধরে ঝাঁট দেওয়া। ঘর মোছার ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। (৪) একটানা মাথা হেঁট

করে গল্পের বই না পড়া। যাঁরা অফিসে কাজ করেন, তাঁদের সারাক্ষণ টেবিলে ঘাড় হেঁট করে না থেকে দু ঘণ্টা অন্তর চেয়ারে হেলান দিয়ে ব্যাক রেস্ট করে নেওয়া। (৫) দেহের সমস্ত শক্তি নিংড়ে একা কোনো ভারী কাজ না করা। এক ঝটকায় কোনো ওজন না তোলা। (৬) রান্নার কাজ দাঁড়িয়ে করা অনেক ভাল। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে রান্নার ব্যবস্থা করে নেওয়া উচিত। শহরাঞ্চলে যাঁরা গ্যাসে রান্না করেন, এ ক্ষেত্রে তাঁদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

প্রশ্ন : ফিজিওথেরাপিতে রোগী কি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়

উত্তর : এই বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলে যদি না রোগীর শারীরিক অবস্থা এবং রোগের তীব্রতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন : ফিজিওথেরাপি করে সুস্থ হবার পর, আবার সেই রোগ হতে পারে কি ফিজিওথেরাপিতে ব্যায়াম, ম্যাসাজ, ছাড়াও যে ধরনের আধুনিক ইলেট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাতে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না ? বা অন্য কোনো উপসর্গ দেখা দিতে পারে না

উত্তর : কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগের পুনরাক্রমণ হতে পারে। তবে একবার সেরে ওঠার পর রোগী যদি বিশেষ সচেতন থাকেন, এবং নির্দেশিত ব্যায়াম নিয়মিত করে যান তবে নতুন করে অসুস্থ হবার ভয় থাকে না অন্য প্রশ্নের উত্তরে বলি ফিজিওথেরাপিতে কোনো সাইড এফেক্ট নেই। যন্ত্র ব্যবহারে কোনো ক্ষতি হয় না।

প্রশ্ন : মহিলারা অনেকেই 'সায়েটিকা'-র ব্যথায় কষ্ট পান। এটা কী ধরনের রোগ ? কেন হয় ? যাঁদের এ রোগ হয়েছে তাঁরা কী কী করবেন।

উত্তর : এটি সায়েটিক নার্ভের যন্ত্রণা। খুবই কষ্টদায়ক। কোমর থেকে পায়ের পাতা অব্দি যন্ত্রণা থাকে। যন্ত্রণা হয় পায়ের পেছন দিক দিয়ে অর্থাৎ যে দিকে সায়েটিক নার্ভ আছে। সায়েটিক নার্ভের যন্ত্রণা বিভিন্ন কারণে হয়। ঝুঁকে কোনো ভারী জিনিস তুলতে গিয়ে নার্ভের উপর চাপ পড়ে এটা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে টিউমার ফর্ম করে, তার ফলে নার্ভের উপর চাপ পড়ে এটা হতে পারে।

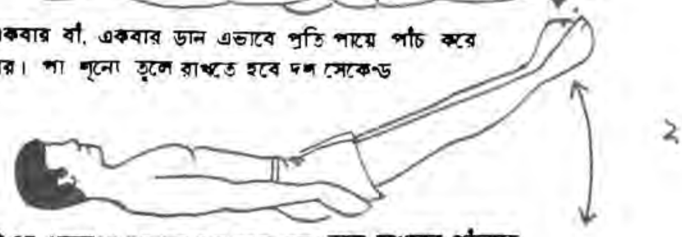
যাঁদের এই রোগ আছে তাঁদের কোমরে

কোমরের ব্যথার জন্যই নির্দেশিত ব্যায়াম



১

১। একবার বাঁ, একবার ডান এভাবে প্রতি পায়ে পাঁচ করে দশবার। পা শূন্যে তুলে রাখতে হবে দশ সেকেন্ড



২

২। দুই পা একসঙ্গে দশ সেকেন্ড করে শূন্যে তুলে রাখবেন পাঁচবার



৩

৩। এভাবে পাঁচবার কোমর ওঠান এবং নামান



৪

৪। ঘাড় এবং বুক ওঠান আর নামান। দশ সেকেন্ড করে উঠিয়ে রাখবেন



৫

৫। বাঁ পা, ডান পা করে প্রতি পায়ে পাঁচবার। শূন্যে দশ সেকেন্ড পা রাখবেন

ট্র্যাকশন দরকার হয়। যন্ত্রণা কমাতে short wave diothermy বা সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ তরঙ্গ শরীরে প্রবেশ করানো হয়। এছাড়া ব্যায়াম আছে। যেমন, চিৎ হয়ে শুয়ে ডান এবং বাঁ পা যথাক্রমে ওপরে তোলা এবং দশ সেকেন্ড রেখে নিচে নামান। জোড়া পা তোলা এবং নামান। এরপর চিৎ হয়ে শোওয়া অবস্থায় পা দুটো ভাঁজ করে নিয়ে কোমরটাকে ওপরে তোলা এবং নামান। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে হাত দুটো পেছন দিকে কোমরের ওপর ধরে রেখে মাথা এবং বুক সামনের দিকে ওঠান এবং নামান। এরপর পা দুটো একটি একটি করে সোজা ভাবে ওপরে ওঠান এবং নামান। এছাড়াও রোগীর অবস্থা অনুযায়ী আরো কিছু ব্যায়াম করানো হয়ে থাকে। তাছাড়া শক্ত এবং সমান বিছানা আর মাথায় পাতলা বালিশ ব্যবহারের নির্দেশ রোগীকে দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : ফিজিওথেরাপির সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা (অত্যাধুনিক মেশিন সহ) বর্তমানে কোথায় আছে

উত্তর : ভারতের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা বলতে All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, বম্বেতে। আর কলকাতায় এস এস কে এম হসপিটালে, যাকে সাধারণভাবে সকলে পি জি বলে জানে। □

সাক্ষাৎকার : আশিস ভট্টাচার্য

চৈত্রের ছাড় ঃ নানা রঙের শাড়ি

চৈত্র মাস। বর্ষ শেষ। চারদিকে সেলের ঢালাও আয়োজন। পুরোনো স্টক ঝাড়াইবাছাই করে বিদেয় করা হচ্ছে। নতুন বছরে আসবে নতুন স্টক। টাকায় ২০ পয়সা, ৩০ পয়সা, ৪৫ পয়সা থেকে প্রায় অর্ধেক দামেও পুরোনো বছরের বাসি মাল বেচে দিচ্ছেন দোকানিরা।

গড়িয়াহাটের বিখ্যাত আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয় ২০ শতাংশ রিবেট দিচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শাড়িতে। ছাপা, তাঁত, সিন্থেটিক, বেনারসী ছাড়াও বিভিন্ন প্রদেশের শাড়িতে স্টক ক্লিয়ারেন্স চলছে। ঢাকুরিয়ার দক্ষিণাপণে স্টক ক্লিয়ার করছে ওড়িশা হ্যান্ডলুম, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মঞ্জুষা, মধ্যপ্রদেশের মৃগনয়না, রাজস্থানের রাজস্থালি, এমন কি বিভিন্ন প্রদেশের হ্যান্ডলুম শিল্পে সেজে থাকা হ্যান্ডলুম হাউস।

হ্যান্ডলুম হাউসে পাবেন যে কোনো ধরনের প্রাদেশিক শাড়ি। বিভিন্ন ডিজাইন। চটকদার রং আর তার সংগে বিভিন্ন প্রদেশের নিজস্ব ছন্দের নিজস্ব নাম। কাঞ্জিভরম, তানচই, পচমপল্লি, টেম্পল পাড়, সাধারণ দক্ষিণী শাড়ি বিচিত্র বুনটের আর রকমারি ডিজাইনের পাবেন ২০ শতাংশ কম দামে। প্রসংগত জানিয়ে রাখি হ্যান্ডলুম হাউসে সাধারণত দাম একটু চড়ার দিকেই থাকে, ট্যাক্স ইত্যাদি আনুষংগিক কারণে খুব সাধারণ মানের শাড়িরও দাম ১০০ টাকার ওপর। ওড়িশা হ্যান্ডলুমে সাধারণ শাড়ি পাবেন ৮০ টাকা থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে। একটু দামী হলে ১৫০ থেকে ৩৫০ – ৪০০-র মধ্যে। রিবেট ২০ শতাংশ। মৃগনয়নায় একজিবিশন চলছে সংগে রিবেট। চলবে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত।

গড়িয়াহাটের হ্যান্ডপ্রিন্ট শাড়ির দোকানগুলিতে রিবেট দেওয়া হচ্ছে। পাক্কা এগারো হাত শাড়ি। পাকা রং, চমৎকার প্রিন্ট। ৫০ টাকা থেকে ৬০ টাকার মধ্যে সেরা কাপড়গুলি পাওয়া যাচ্ছে। মাত্র ২৫–৩০ টাকায় ম্যাক্সি, কাফতান পাওয়া যাচ্ছে অঢেল। এছাড়া রিবেটে অন্যান্য ড্রেস মেটেরিয়ালও আছে।

তন্তুজ, তন্তুশ্রী ছাড় দিচ্ছে ২০ শতাংশ। যাবতীয় তাঁতের শাড়ি এদের স্টক এছাড়া বিছানার চাদর, ধুতি, গামছাও আছে। প্রায় ৫০ শতাংশ ছাড়েও খালি করে দেওয়া হচ্ছে কিছু কিছু পুরোনো স্টক। বেছে নিতে পারলে মন্দ নয়।

ইউ পি হ্যান্ডলুম রিবেট দিচ্ছে ২০ শতাংশ থেকে বিভিন্ন বস্ত্রে পোশাকে প্রায় ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত। শাড়ি ড্রেস মেটেরিয়াল বিছানার চাদর, পরদা, সোফার ঢাকনা অবিশ্বাস্য কম দামে পাওয়া যাচ্ছে।

গুজরাট সরকারের প্রযোজনায় গুজরাট এম্পোরিয়াম ছাড় দিচ্ছে ২০ শতাংশ। এই ছাড় চলবে ১৭ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত।

খাদি ভবন ছাড় দিচ্ছে সাধারণ সুতি খাদিতে ৩৫ শতাংশ, ব্লিন্ড সিল্ক, স্পান সিল্কে ২৫ শতাংশ, ৩০ শতাংশ, পিওর সিল্কে ২০ শতাংশ। রেডিমেড পাঞ্জাবি পাবেন খদ্দরের ২৫, ৩০, ৩৫ টাকায় বিভিন্ন মাপের, চমৎকার রঙের।

শ্যামবাজারের মোহন স্টোর্স বিনির কাপড়ের ডিলার। তবে অন্যান্য কোম্পানির প্যান্ট পিস, শার্ট পিস, ড্রেস মেটেরিয়ালও তারা রাখে। একে চৈত্র মাস, স্টক ক্লিয়ারেন্স তার ওপর ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১০ শতাংশ বিশেষ ছাড় দিচ্ছে মোহন স্টোর্স। জিনস, কর্ডুরয়, টেরিকটন কাট পিস পাবেন। দাম শুরু ৮০ টাকা থেকে। থান থেকে কেটেও কাপড় কিনতে পারেন। ছাড় যাবে ২০ বা ৩০ শতাংশ। শ্যামবাজারের মাদ্রাজ হ্যান্ডলুম, কো অপটেক্স এ পাবেন দক্ষিণী শাড়ি। দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব টাই-ডাই, বিরল ডিজাইনের চোখ ধাঁধানো রঙের শাড়ি। রিবেট ২০ শতাংশ।

বম্বে ডাইং এর দোকান ভারতী, টাটা টেক্সটাইলস এর দোকান মীনাক্ষী ছাড় দিচ্ছে ২০ শতাংশ। শাড়ি ড্রেস মেটেরিয়াল বেডকভার, তোয়ালে পুরনো স্টকের যাবতীয় কম দামে সাফাই করা হচ্ছে।

ইদানীং অবশ্য বেডকভার, বেডশিটের জন্য বোম্বে ডাইং-এর তুলনায় এন টি সিই টানে বেশি। কারণ দাম তুলনামূলকভাবে ঢের কম। সিংগল বেডশিট ৩৫ টাকা থেকে শুরু। কোয়ালিটির হেরফেরে দাম ক্রমশ বেড়েছে। জোড়া লাগান ডবল বেডশিটও আছে, পাকা রং সুন্দর প্রিন্ট। রিবেট চলছে ২০ শতাংশ থেকে প্রায় ৫০ শতাংশ। পর্যন্ত।

আর শুধু জামাকাপড়ই বা কেন। বাটার জুতোও পাবেন এই চৈত্রের বর্ষশেষে। বাটার ক্যাটলজ জুতোয় ছাড় ২০ শতাংশ। পাবেন বাটা বাজারে। স্পেশাল এই ডিসকাউন্ট চলবে ২৭ মার্চ থেকে ৪ মে পর্যন্ত। □

বর্ণালী দাস



ছবি : তপন দত্ত

কর্মসংস্থান

পরীক্ষার অবসরে তিন মাস



মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষারও ইতি। তিন মাস লম্বা ছুটি। সিনেমা দেখে, আড্ডা মেরে, গল্পের বই পড়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি গিয়ে পাক্কা নব্বই দিন ছুটি কাটিয়ে দেওয়া যায় অনায়াসেই। কিন্তু একটু বাস্তবচিন্তা করলে দেখা যাবে তিন মাস সময়টা ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের প্রস্তুতির পক্ষে কম নয়। ছুটির অবকাশের মধ্যে ছোটখাটো কিছু শিখে নিতে পারলে ভবিষ্যতে তা অবশ্যই কাজে লাগবে।

তবে সবার আগে দরকার কী শিখতে চাই সেটা সঠিকভাবে বাছাই করে নেওয়া। কারণ সময়টা খুবই সীমিত। মাত্র তিন মাস। তারপরই পরীক্ষার ফল, কলেজের পড়াশুনো শুরু। সুতরাং যাই শিখি না কেন তিন মাসের মধ্যেই সেটা কিছুটা আয়ত্ত করে নেওয়া চাই, আরও ভালো হয় কোর্সটি যদি তিনমাসেরই হয়।

ছোটখাট নানা প্রশিক্ষণ শিবির ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মহানগরী বা শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায়। এখুনি না হলেও ভবিষ্যৎ জীবনে এ সমস্ত অর্থকরী বিদ্যা কাজে লাগতেও পারে।

প্রথমেই বলি প্রতি পাড়াতেই অলিতে গলিতে না খুঁজতেই পাওয়া যাবে টাইপিং-এর স্কুল। তিন মাস সময়ে পাকা টাইপিস্ট হওয়া না গেলেও টাইপিং-এর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ এই সমস্ত স্কুলে তিন মাসে নিয়ে নেয়া যায়। সকালে বা সন্ধেয় ঘন্টাখানেক ক্লাস, বেতন যৎসামান্য ১৫ টাকা থেকে ২৫ টাকার মধ্যে। শর্ট হ্যান্ড সম্পর্কেও ওই একই কথা। তিন মাসে এ বিদ্যায় পাকা না হওয়া গেলেও কাজ চালান বিদ্যাটুকু আয়ত্ত করা যায়। এরপর যদি নিয়মিত এর চর্চা রাখা যায় তাহলে একজন দক্ষ স্টেনোগ্রাফারের কৃতিত্ব দাবি করবেন আপনি। আর কাগজ খুললেই স্টেনোগ্রাফারের চাকরি। ভালো স্টেনোগ্রাফার যে পাওয়াই যায় না।

মাতৃভাষা আর ইংরেজির বাইরে তৃতীয় ভাষা ভালোভাবে শিখে নিলেও ভবিষ্যৎ জীবনে কাজের সুবিধা, কাজ পাবার সুযোগ। বিদেশী ভাষা যেমন ফরাসী, জার্মান, রুশ তিন মাসে শিক্ষার কোন প্রশিক্ষণ শিবির চালু নেই। কারণ এত অল্প সময়ে এ ভাষাগুলির বর্ণমালাও শেখা যায় না। তবে তিনমাসের কন্ডেন্সড কোর্সে হিন্দি শেখানো হয়। শ্যামবা[redacted] এ ভি স্কুলে সান্ধ্য বিভাগে হিন্দি ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স চালু আছে। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রিক ভাষা হিসেবে এ ভাষার কদর ক্রমশ বাড়ছে, কর্মজগতেও ক্রমশই বাড়ছে এর চাহিদা। সুতরাং এ ভাষার প্রাথমিক পাঠ রপ্ত করে নিলে আশা করা যায় ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

ইকেবানা মানে জাপানি কায়দায় ফুল সাজানোর একটি কোর্সও চালু আছে ওই শ্যামবাজার এ ভি স্কুলেই। এ বিদ্যায় হয়তো সরাসরি চাকরির সুযোগ নেই তবে স্বাধীন ব্যবসার সুযোগ করে নেয়া যায়। ডল মেকিং আর বিউটিফিকেশনের কোর্সও চালু আছে এখানেই। ক্লাস হয় সন্ধেবেলাতেই। এক ঘন্টা থেকে দু ঘন্টা। এই প্রশিক্ষণে কিছু মেটিরিয়াল প্রয়োজন হয়। বেতন এককালীন নিয়ে নেওয়া হয় এই কারণেই। স্বাধীন ব্যবসার পক্ষে বিদ্যেটি মন্দ নয়।

মড্যুলার সার্টিফিকেট কোর্স চালু আছে উইমেনস প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিট্যুট, ৬ সৈয়দ আমীর আলি অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৭-তে। এখানে মড্যুলার বেসিক কোর্স চালু আছে দু' মাসের। সম্পূর্ণ কোর্সটির জন্য মোট ৭৫০ টাকা এককালীন লাগবে। ক্লাস হয় সকালে ও সন্ধ্যায়।

তিন মাসের কেবল কোর্স চালু আছে এই শিক্ষণ শিবিরেই। এককালীন ৮৫০ টাকা জমা দিয়ে এই কোর্সে ভর্তি হতে হয়। ক্লাস হয় সকালে ও সন্ধ্যায়। এক মাসের ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর কোর্স চালু আছে এখানে। সম্পূর্ণ কোর্সটির জন্য ৫০০ টাকা লাগে। এছাড়া টাইপ রাইটিং এর জন্য ফি আলাদা, ৩০০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়।

আরেকটি যে কোর্স করলে চাকরি পেতে বিশেষ সুবিধে হয় তা হল টেলিফোন অপারেটিং কাম রিসেপশনিস্ট কোর্স। তিন মাসের কোর্সটি করানো হয় ওই উইমেনস প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটেই। ভর্তি ফি ১৫০ টাকা, টুইশন ফি ৩০০ টাকা। মোট ৪৫০ টাকা সম্পূর্ণ কোর্সের জন্য এককালীন জমা দিতে হয়। সময় প্রার্থী বা প্রার্থীদলের সুবিধা অনুযায়ী। □

বর্ণালী দাস

ছবি :

খোশ গপ্প

দেবশ্রীর বিয়ে

স্টুডিও পাড়ার খবর : দেবশ্রী রায়ের ছবির সংখ্যা নাকি দিন দিন কমছে। ব্যাপারটা কী ? শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে কানাকানি থেকে সত্যিই কি বিয়ের পিঁড়িতে বসছে দেবশ্রী। তবে প্রসেনজিৎ যে ইদানিং দেবশ্রীর দিকে বিশেষ নজর রাখছে, তা অনেকেরই চোখে পড়েছে। এই তো সেদিন শমিত ভঞ্জর 'ওরা চারজন' ছবির শুটিং চলছিল। ফ্লোরে যখন সকলে ব্যস্ত, ঠিক তখনই মেক-আপ রুমে ওষুধের শিশি থেকে ওষুধ নিয়ে দেবশ্রীর গলায়



ঢেলে দিচ্ছিল প্রসেনজিৎ। আর ঠিক সেই সময় পরিচিত এক চিত্র সাংবাদিককে দেখে দেবশ্রী ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে ইঙ্গিত করল – চুপ!

নয়নার শক্তি

পরিচালক বিজয় চট্টোপাধ্যায় দলবল সহ ডায়মন্ডহারবারে শুটিং করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দৃষ্টিদান'। দূরদর্শনের হিন্দি ছবি। ক্যামেরাম্যান ছিলেন সৌমেন্দু রায়। অন্যতমা শিল্পী নয়না দাস। ইউনিট উঠেছিল সাগরিকা হোটেলে। এই হোটেলেই অন্য ঘরে ছিলেন বোম্বের বিখ্যাত পরিচালক শক্তি সামন্ত। সঙ্গে লেখক শক্তিপদ রাজগুরু। উদ্দেশ্য শক্তি সামন্তর



আগামী ছবির চিত্রনাট্য লেখা। এখানেই নয়না নজরে পড়ল সামন্তজীর। তিনি তো বেশ জোরেই বললেন, এখানকার পরিচালকরা কেন যে বোম্বে যাচ্ছে নায়িকা খুঁজতে! কলকাতাতেও তো নায়িকা আছে। একটু খুঁজে নিতে হবে। নয়না তো বেশ ভাল অভিনয় করে। ওকে নিয়ে তো এরা ছবি করতে পারে। মেয়েটার মধ্যে অ্যাক্টিং পসিবিলিটি আছে। কেন আপনারা বোম্বে দৌড়চ্ছেন ?



গুরু কোথায় ?

রাঁচিতে বীরেশ চ্যাটার্জির 'তুফান' ছবির আউটডোর চলছিল। শুটিং জোনে সকলে কর্মব্যস্ত। হঠাৎ স্কুটার হাঁকিয়ে এলেন দুই মহিলা। একজন বিবাহিতা বয়কাট চুল মাথায়। পেছনে একটি কম বয়সী মেয়ে। শুটিং জোনে এসে ব্রেক কষলেন স্কুটারের। চিৎকার করে হাঁক পাড়লেন : গুরু কোথায় ? গুরু কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন – গুরু কে

কেন, তাপস পাল!

তিনি তো আসেননি।

– গুরু কি আজকে হেলিকপ্টার থেকে দড়ি ঝুলে নামবেন

– না তিনি কালই শুটিং শেষ করে চলে গেছেন।

– যাহ্ বাবা, আমাদের আশাটাই বৃথা! আর কোন কথা না বলে স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে চলে গেলেন ওঁরা।



বাবলুর মাঠ বদল

সেদিন হঠাৎ সুমিত্রা মুখার্জি বাবলুর পায়ের কাছে কেঁদে পড়ল। চকিত চমক কাটতেই বোধগম্য হল ব্যাপারটা। সুখেন দাসের ছবি 'মা-এক মন্দির'-এর শুটিং চলছিল। খেলার মাঠে বাবলু অর্থাৎ সুব্রত ভট্টাচার্য এবার গড়ের মাঠ ছেড়ে টালিগঞ্জের মাঠে খেলতে নেমেছেন। তবে খেলোয়াড়ের চরিত্র নয়। কোলিয়ারি ম্যানেজারের চরিত্র। ফিল্ম মিডিয়াটা দারুণ লাগছে সুব্রতর। চুনী গোস্বামীর পর সুব্রত ভট্টাচার্য – এক ছবিতেই শেষ না কী

অর্ধচন্দ্র

নিজেকে জানুন

(মনঃপ্রশ্নচর্চা)

ডঃ অসীম বর্ধন

আপনার আচরণ-ভব্যতা কেমন ?

ভব্যিযুক্ত আচরণ আমাদের প্রত্যেকেরই সম্পদ। যে যতখানি ভব্যতা শেখে, তার সেই সম্পদ বেশি। সৌজন্যপূর্ণ আরচণ নিয়ে সমানভাবে সকলের সংগে মেলামেশা করতে পারলে আমরা বন্ধুলাভ করতে পারি; মর্যাদা, সম্ভ্রম এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারি।

নিচের মনঃপ্রশ্নচর্চাটিতে প্রত্যেক প্রশ্নে আপনি আন্তরিকভাবে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' জবাব দিয়ে যান। তাহলে আপনার আচরণ কতখানি ভব্য বা অভব্য, তা নিজেই যাচাই করবার একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

১। সকলে যাতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে, তার জন্যে কি আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ?

২। যখন বন্ধুবান্ধবদের সংগে কখনো খাওয়া-দাওয়া করতে বসেন, তখন কি আপনার আচরণ দিয়ে প্রকাশ করেন যে, আপনি খাবার-দাবার খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছেন ?

৩। যখন আপনার সংগে কেউ দেখা করতে আসেন, তখন আপনি কি রেডিও বন্ধ করে দিয়ে কথা বলেন ?

৪। আপনি কি বলেন যে, আপনি উঁচুমহলের আদবকায়দা খুব রপ্ত করে ফেলেছেন ?

৫। আপনার বাড়ির পরিবারবর্গের সকলের কথাই কি সহানুভূতি দিয়ে বিবেচনা করে সেইমতো আচরণ করেন ?

৬। দোকানের কর্মচারী কিংবা রেস্টুরেন্টের বয় যারা আপনাকে খুব যত্ন করে, তাদের প্রতি মিষ্টি ব্যবহার করার জন্য আপনার কি ইচ্ছে হয় ?

৭। আপনার ভুল হয়ে গেছে দেখামাত্রই আপনি কি তৎক্ষণাৎ মাফ চেয়ে নেন ?

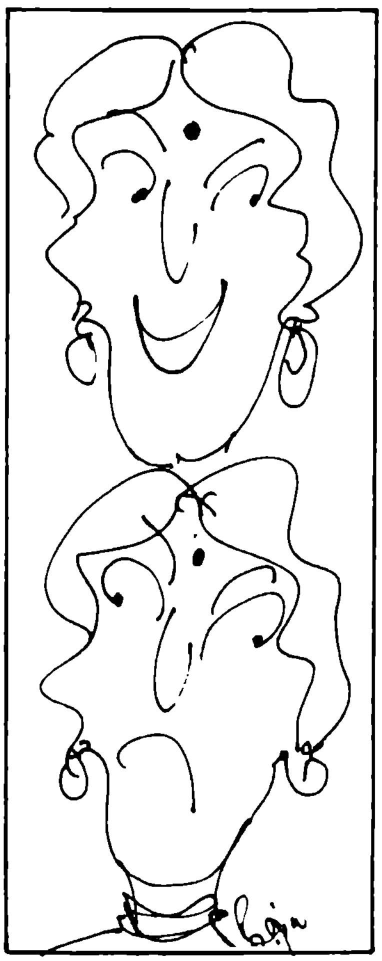
৮। আপনি কি ঘরে-বাইরে প্রায়ই 'ধন্যবাদ' এবং 'করে দিলে ভালো হয়' – এই ধরনের সৌজন্যপূর্ণ কথা বলেন ?

৯। লোকে যাতে কোনো অসুবিধা ভোগ না করে, তার জন্যে আপনি কি দরকার হলে নিজের কাজের ধারাও বদলে নেন

১০। আপনি কি ফলাও করে কথা বলা কিংবা জাঁকজমক দেখানো এড়িয়ে চলেন ?

১১। লোকে যখন কথাবার্তা বলছে, তার মাঝখানে বাধা দিয়ে কথা বলতে কি আপনার ইচ্ছে হয় ?

১২। কেউ আপনাকে উপহার পাঠালে আপনার সন্তোষ জানিয়ে তাঁকে খবর পাঠাতে আপনি কি কখনো দেরি করে ফেলেন ?



১৩। কারুর কোনো অনুরোধ যদি আপনি না রাখেন, তাহলে তিনি মনঃকষ্ট পেয়েছেন কি না, আপনি বোঝবার চেষ্টা করেন কী ?

১৪। কারুর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেলে আপনি কি প্রকাশ্যে খুব গর্ব প্রকাশ করেন

১৫। আপনি কি কখনো রাস্তার মাঝখানে কাগজের মোড়ক, ঠোঙা ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলেন ?

১৬। আপনি যখন বেশ চতুরভাবে কোনো কথা বলেন, তখন তা মানুষের মনে আঘাত দিচ্ছে কি না তা আপনি লক্ষ্য করেন

১৭। কোনো জায়গায় যাবার কথা থাকলে আপনি কি প্রায়ই সেখানে যেতে দেরি করে ফেলেন ?

১৮। যখন কারুর কাজেকর্মে আপনি বিরক্ত হন, তখন কি অপ্রীতিকর মন্তব্য করেন

১৯। আপনি কি পোর্টেবল ট্রানজিসটর রেডিও সেট বা টেপরেকর্ডারি নিয়ে এমন জায়গায় বাজাতে থাকেন, যেখানকার লোকজন ওসব শোনা পছন্দ না করতেও পারে

২০। আপনি কি কখনো 'ঘাসের উপর হাঁটিবেন না', 'ফুল তুলিবেন না', 'ধূমপান নিষেধ' 'নো পার্কিং', 'কীপ টু দ্য লেফট' – এইসব ধরনের নোটিশ কোথাও দেখলে তা না মেনে নিজের মতোই চলেন

আন্তরিকভাবে সততার সংগে সব কটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তো ? কোন্ কোন্ প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বা 'না' জবাব হয়েছে, তা অবশ্যই লিখে রাখুন। আগামী সংখ্যায় আপনার জবাবগুলির বিশদ ব্যাখ্যাসূত্র দেখতে পাবেন এবং সেই সংগে পাবেন আপনার আচরণ-ভব্যতা উন্নত করে তোলার সুস্পষ্ট মনোবৈজ্ঞানিক পথনির্দেশ।

অনিদ্রা থেকে রেহাই পেতে

(গত সংখ্যায় প্রকাশিত মনঃপ্রশ্নচর্চার সঠিক উত্তরসহ তাৎপর্য ও ব্যাখ্যাসূত্র)

সঠিক উত্তর এবং তার তাৎপর্য :

১। **ভুল :** ঘুমের প্রথম কয়েক ঘণ্টা ঘুম সবচেয়ে গভীর হয় এবং তখন সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি দেয় – রাত বারোটায় হোক, কি যখনই হোক।

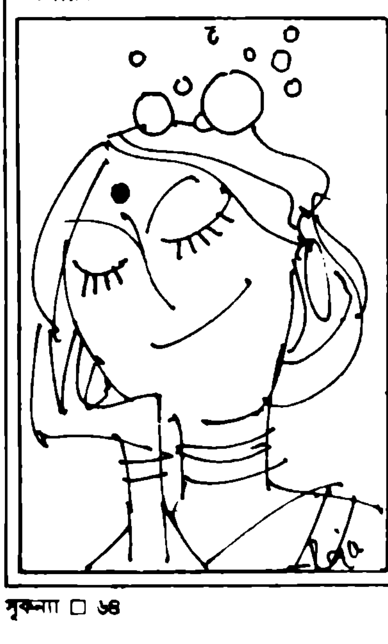
২। **ঠিক :** ঘুমের জায়গা ঠিক না থাকা যেমন একটি কারণ, তেমনি ঘুমোনোর কোন বদ স্বভাব, শারীরিক অসুস্থতা, যন্ত্রণা, বেদনা কিংবা মানসিক উৎকণ্ঠার ফলেও অনিদ্রা হয়।

৩। **ভুল :** গুনতে হলে মনকে কাজ করতে হয়। আর সেই জন্যেই ঘুম ডেকে আনার উদ্দেশ্যটাই বার্থ হয়।

৪। **ভুল :** লক্ষ্য করে দেখা গেছে, অধিকাংশ বয়স্ক লোকেদের পক্ষেই আট ঘণ্টার বেশি ঘুম বিশেষ কাজে লাগে না। অন্য কোনো দৈহিক বা মানসিক কারণ খুঁজতে হবে বেশি ঘুমের দরকার বোধ হলে

৫। **ঠিক।**

৬। **ভুল :** লোকে যা মনে করে, ব্যাপারটা আসলে ঠিক তার উল্টো। কফিতে যেমন কাফিন থাকে, চায়েতেও তেমনি উত্তেজক থাকে এবং মস্তিষ্ক ও কিডনিতে একই রকম উত্তেজনা জাগায়।



৭। **ভুল :** ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মতো ঘুমের বড়ি খেলে অনেকের অনেক যন্ত্রণা, মানসিক আঘাত কমে। তবে, কতকগুলি ঘুমের ওষুধ খেতে খেতে স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়, আবার কতকগুলি খেয়ে এলার্জি জন্মে যায়। তাছাড়া, ঘুমের ওষুধ বাড়িতে রাখলে তা থেকে মৃত্যু বা আত্মহত্যার মতো দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে।

৮। **ভুল :** মানুষভেদে বয়সভেদে বিভিন্ন জনের ঘুমের প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের, তবে বেশির ভাগ বয়স্ক লোকেরই আট ঘণ্টার ঘুম দরকার হয়। নেপলিয়নের মতো লোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় বটে, তবে তাঁরা রাত্রে কম ঘুমোলেও সারাদিনের মধ্যে মাঝে মাঝে বিশ্রাম বা তন্দ্রার সুযোগ করে নেন।

৯। **ভুল :** খুব বেশি দেহের বা মনের উত্তেজনা হলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসা শক্ত হয়ে পড়ে। অনেকে ঘুমোবার আগে খুব ঠাণ্ডা কিংবা গরম গরম জলে স্নান করে নেন, তাতেও দেহ-মন এত চাঙা হয়ে ওঠে যে, ঘুম আসতেই চায় না।

১০। **ভুল :** গবেষণায় দেখা গেছে, একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার নীরন্ধ্র নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘুমের ব্যাঘাতই ঘটে। একটু অন্ধকার এবং মোটামুটি নিরিবিলি ঘরে খুব ভাল ঘুমই হয়।

১১। **ঠিক :** বিছানা খুব শক্ত বা খুব নরম হবে না। দেহের ভারে যেন বিছানা ঝুলে না পড়ে।

১২। **ভুল :** খুশিভরা স্বাস্থ্যবান শিশুরা প্রথম কয়েক মাস দিনে ২০ থেকে ২২ ঘণ্টাই ঘুমোয়।

১৩। **ঠিক** ১৪। **ঠিক** ১৫। **ঠিক।**

ঘুম সম্পর্কে এই সব বিস্ময়কর কথা নিয়ে ভাবতে ভাবতে হয়ত আপনার এত ভাল লেগেছে যে, এখনো ঘুমোতে যাননি! তবে সত্যি যদি আপনি অনিদ্রার অস্বস্তিতে কষ্ট পাচ্ছেন বলে মনে করেন, তাহলে এইসব কথা হয়ত আপনাকে ভবিষ্যতে রাত্রির সুখনিদ্রা এনে দিতে অনেকখানি সাহায্য করবে।

মনে রাখবেন – মানসিক আবেগ প্রক্ষোভের উৎকণ্ঠাই অনিদ্রা রোগের বড় কারণ। অতএব, বিছানায় শুতে যাবার আগে এগুলোকে সংগে নিয়ে শোবেন না যেন!

সুকন্যা

সহকারী সম্পাদক : রানা দাস
শিল্প-উপদেষ্টা : নিতাই ঘোষ

চিফ এগজিকিউটিভ
বিপণন বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ :
সি এইচ বসু, কলকাতা

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি (কলকাতা ও পূর্বাঞ্চল) :
অ্যাডিমেক্স মিডিয়া মার্কেটিং সার্ভিস
পি-৫৬৪, লেক রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৯
ফোন : ৪৬ ১৫৫৮

সার্কুলেশন কণ্ট্রোলার : প্রসাদচন্দ্র দত্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর ও রেজি: অফিস :
ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড,
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭২
ফোন : ২৭ ২১৬৯ ২৭ ৯২৯২ ২৭ ৯৩১১ ২৬ ১৬৮০, ২৬ ১৬৮১,
Telex 021-5092 IPPL IN

দিল্লি অফিস :
সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ১২১২ ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১,
ফোন : ৩৩১ ৭০২৪
জোনাল ম্যানেজার, নর্দার্ন জোন :
ওয়াই এ শেঠি, দিল্লি
জনসংযোগ :
শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, দিল্লি

বোম্বাই প্রতিনিধি : ভি সত্যমূর্তি
বোম্বাই অফিস :
বিশালে বিজনেস সেন্টার, ওয়ার্ডেন হাউস (দ্বিতল)
স্যার পি এম রোড ফোর্ট, বোম্বাই ৪০০ ০০১
ফোন : ২৮-৭২২৯৫, ২৮-৭২৩৩৪, ২৮-৭১৩৫৮
Grams VIBICENT
Telex 011-5726 AMSI-IN

ব্যাংগালোর প্রতিনিধি : সি আর ভরত
১০৯ এন জি ই এফ কলোনি, রাজামহল বিলাস, এক্সটেনশন II স্টেজ ব্যাংগালোর ৫৬০ ০২৪

হায়দ্রাবাদ প্রতিনিধি : এস শংকরনারায়ণ
ফ্ল্যাট সি ২ দামোদর কৃপা, ১ ১-৫০৮/সি ২ বাকারাম, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ৩৮০, ফোন : ৬৩ ৭০০

মাদ্রাজ প্রতিনিধি : পি এস রামমূর্তি
৩৭ পেরুমল স্ট্রিট পুরসাওয়াকম, ফ্লাওয়ার্স রোড পোস্ট, মাদ্রাজ ৬০০ ০৮৪, ফোন : ৬৬ ৪৭২১

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০ ০১৩ (ফোন : ২৪ ০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।

নতুন সাজে অসাধারণ সাপ্তাহিক



খেলার আসর

আরও আকর্ষণীয় ঝকঝকে ছাপা আর দারুণ রঙীন প্রচ্ছদ

মাত্র ২.৫০ টাকায় ৪৪ পৃষ্ঠার এমন খেলার পত্রিকা আর কোথায়

আপনি কিনছেন কি

যদি না কিনে থাকেন, কাছাকাছির স্টলে অথবা এজেন্টকে বলে রাখুন

প্রতি শুক্রবারে পাবেন

গ্রাহক হতে লিখুন

ইত্যাদি প্রকাশনী লিঃ ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলি-৭২

SUKANYA 1 APRIL 1988 Regn. No. 42166/84/RNI Postal Regn. No. WB/ CC-423 Rs. 5.00

